ইউনিট ৭: শিক্ষার সামাজিক কার্যাবলি

Social Functions of Education

ভূমিকা

মানুষ সামাজিক জীব। তার জন্ম হতে মৃত্যু অবধি সকল কিছুই সমাজের ভেতরে ঘটে থাকে। তাই সমাজ বিছিন্ন কোন কাজ মানুষের জীবনে নেই। সমাজকে সুস্থ, সুন্দর, কল্যাণময় করার জন্য দরকার প্রয়োজনীয় শিক্ষা। শিক্ষাই মানুষকে সঠিক পথের নির্দেশনা দেয়। সব ধরনের সামাজিকীকরণে, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য গঠনেও শিক্ষাই মূখ্য ভূমিকা পালন করে। সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন বলতে যা বুঝায় তা শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান ইউনিটে শিক্ষার সামাজিক কার্যক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে ইউনিটকে নিম্নরূপে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ ৭.১ : শিক্ষার সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া
পাঠ ৭.২ : শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়ন
পাঠ ৭.৩ : সংস্কৃতি ও শিক্ষা (সংস্কৃতি সংরক্ষণ, হস্তান্তর, সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, উপসংস্কৃতি, লোক সংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য)
পাঠ ৭.৪ : উদ্ভাবন ও শিক্ষা
পাঠ ৭.৫ : সামাজিক পরিবর্তন ও অভিযোজন
পাঠ ৭.৬ : মূল্যবোধ ও নৈতিকতার উন্নয়ন
পাঠ ৭.৭ : মুক্তচিন্তার বিকাশ ও অনুশীলন
পাঠ ৭.৮ : নাগরিক মান উন্নয়ন ও শিক্ষা

পাঠ ৭.১: শিক্ষার সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া
Socialization Process of Education

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সামাজিকীকরণ কী তা বলতে পারবেন।
- সামাজিকীকরণের মাধ্যমগুলো কী কী তা সনাক্ত করতে পারবেন।
- সামাজিকরণের মাধ্যম হিসেবে শিক্ষার ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষা ও সামাজিকীকরণ পরস্পর কীভাবে জড়িত তা বর্ণনা করতে পারবেন।

সামাজিকীকরণ (Socialization)

মানুষ সামাজিক জীব। তাই সে সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসবাস করতে পারে না। মানব জীবনের পূর্ণ বিকাশে প্রয়োজন সামাজিকতা। ব্যক্তি মানুষ সমাজের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, সমাজেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং সমাজ থেকেই বিদায় নেয়। অর্থাৎ, একজন মানুষের পূর্ণ জীবনচক্র সমাজকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। এ জীবন পরিক্রমায় প্রতিটি মানুষ নিজেকে ক্রমাগত সমাজের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে শেখে ও খাপ খাইয়ে চলে। সমাজের উপযোগী করে নিজেকে গড়ে তোলে, নিজের মধ্যে সামাজিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটায়। সমাজের ভাবধারা, রীতি-নীতি, প্রথা, আদর্শ ইত্যাদির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে হয়। ব্যক্তি মানুষের সামাজিক জীব হিসেবে গড়ে ওঠার এ প্রক্রিয়াই হচ্ছে সামাজিকীকরণ বা Socialization।

'সামাজিকীকরণ' বলতে আমরা বুঝি– ব্যক্তি তার স্বীয় সমাজের কিছু সামাজিক আদর্শ, রীতি-নীতি, মুল্যবোধ, মনোভাব, বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ গ্রহণ করে এবং এগুলো ব্যক্তি তার নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করে। সামাজিকীকরণ একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

সামাজিকীকরণ এমন একটি প্রক্রিয়া যা ব্যক্তিকে তার সামাজিক ভূমিকা যথার্থভাবে পালনে সক্ষম করে তোলে। বস্তুত, সামাজিকীকরণের মাধ্যমে একজন ব্যক্তির সহজাত প্রবৃত্তি (Instinct) পরিবর্তিত হয়ে মানবিক রূপ ধারণ করে। এর ফলে সে একজন পরিপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সামাজিকীকরণ হচ্ছে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকরণের (Individualization) একটি বিশিষ্ট প্রক্রিয়া। সামাজিকীকরণ এমন একটি প্রক্রিয়া যা ব্যক্তিকে সামাজিক (Social) হতে শেখায়। সামাজিকতা একটি গুণ বিশেষ।

সামাজিকীকরণের বিশেষজ্ঞ মতামত

'Socialization' বা 'সামাজিকীকরণ কথাটি সমাজবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। ফলে বিভিন্নভাবে তাঁরা সামাজিকীকরণে তাঁদের মতামত প্রদান করেছেন।

গিলিন এবং গিলিন (Gillin and Gillin) বলেন, "By the term 'Socialization' we mean the process by which individual develops into a functioning member of the group according to its standards, conforming to its modes, observing its traditions and adjusting himself to the social situations". (Cultural Sociology, P. 112) অর্থাৎ সামাজিকীকরণ বলতে আমরা এমন একটি প্রক্রিয়াকে বুঝি, যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি একটি গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে তার

মূল্যবোধ, মানদন্ড ও ঐতিহ্য অনুসারে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। আর এভাবে সে নিজেকে সামাজিক অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেয়।

আরনল্ড গ্রীন (Arnold Gree)-এর মতে, 'Socialization is the process by which the child acquires a cultural content, along with selfhood and personality". (Sociology, P. 127)। অর্থাৎ সামাজিকীকরণ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি শিশু আপন সংস্কৃতির সাথে সুপরিচিত হয় এবং এভাবে তার অহংবোধ ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে।

ওয়াটসন (Watson) বলেন, "Socialization is the process of teaching the individual through various relationship, educational agencies and social controls, to adjust himself to living in his society". অর্থাৎ, বিভিন্ন সম্পর্ক, শিক্ষার মাধ্যমে এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে ব্যক্তিকে সমাজে বাস করার উপযোগী করে গড়ে তোলার প্রক্রিয়াই হচ্ছে সামাজিকীকরণ।

নেইল জে. স্মেলসার (Neil J. Smelser) বলেন, "Socialization as the ways in which people learn the skills and attitudes relevant to their social roles". অর্থাৎ, সামাজিকীকরণ হচ্ছে সমাজে নির্দিষ্ট ভূমিকা পালনের দক্ষতা এবং মনোভাব গড়ে তোলার প্রক্রিয়া।

সামাজিকীকণের মাধ্যমসমূহ (Agencies of Socialization)

সাজাজিকীকরণ যেমন মানব সমাজ ও সমাজ জীবনের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তেমনি এটি একটি জটিল বিষয়ও বটে। একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল প্রক্রিয়া হিসেবে সামাজিকীকরণ নিজেই ঘটে না। এই সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াটি কিছু মাধ্যম বা বাহনের (Agency) সাহায্যে ক্রিয়া করে। অর্থাৎ এ সমস্ত মাধ্যম বা বাহনের সাহায্যে ব্যক্তির সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় এবং ক্রিয়া করে। সামাজিকীকরণের মাধ্যমসমূহের মধ্যে যেগুলো উল্লেখযোয্য সেগুলো হলো–

পরিবার (Family), খেলার সাথী (Play Males) ও সমবয়সী দল (Peer Group) বা বন্ধু Friends), শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (Educational Institution), ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (Religious Institution), গণ-যোগাযোগের মাধ্যমসমূহ (Mass Media), পেশাগত সংস্থা (Professional Organization), রাষ্ট্র (State), সাংস্কৃতিক সংগঠন (Cultural Organization), কর্ম ক্ষেত্র (Work Place), স্থানীয় সম্প্রদায় (Local Community), প্রতিবেশী (Neighbor) ইত্যাদি।

সামাজিকীকরণ ও শিক্ষা (Socialization and Education)

সামাজিকীকরণ হলো এমন এক প্রক্রিয়া যা বিরতিহীনভাবে ব্যক্তির জীবন জুড়ে চলমান থাকে। প্রত্যক্ষভাবে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর। তারপর এই প্রণালী নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে ব্যক্তির মৃত্যু পর্যন্ত। এটি এমন এক প্রক্রিয়া যা ব্যক্তির জীবনে অতি শৈশবকাল থেকেই শুরু হয়ে যায়। প্রথমে চলে অনুকরণ ও অনুসরণ, পরে চলে অনুশীলন বা শিক্ষা গ্রহণ। এ রকমভাবে ব্যক্তি সমাজের নিয়ম-কানুন শিক্ষা লাভ করে সমাজের একজন উপযুক্ত সদস্য হিসেবে গড়ে উঠে। সামাজিকীকরণ এক ধরনের সামাজিক শিক্ষা। মানুষ সংস্কৃতিবান প্রাণী হলেও সংস্কৃতির ধ্যান-ধারণা তাকে অন্যের কাছ থেকে শিখতে হয়। কাজেই সামাজিকীকরণের সাথে শেখার (Learning) বিষয়টি জড়িত। এই প্রক্রিয়াটি একান্তভাবেই শিখনের অঙ্গ। আর শিখন তো শিক্ষারই অন্তর্গত। সে জন্যই সামাজিক শিক্ষার অপর নাম সামাজিকীকরণ সমাজ ও সংস্কৃতি বা সামাজিক জীবন ধারার বৈশিষ্ট্যগুলো সংরক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবস্থা সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং এ ভূমিকা পালনের মধ্যেই শিক্ষার সঠিক তাৎপর্য নিহিত আছে বলে সমাজবিজ্ঞানীদের অভিমত। সমাজবিজ্ঞানীগণ শিক্ষার

সামাজিক তাৎপর্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন এবং এদিক থেকেই শিক্ষার ভূমিকা বিচার বিশ্লেষণ করেন। সমাজের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমেই সমাজের আদর্শ, কৃষ্টি ও জীবন ধারার ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। সমাজের গুরুত্বপূর্ণ কৃষ্টি, আদর্শ ও জীবন ধারাগত বৈশিষ্ট্যগুলো শিক্ষার মাধ্যমেই স্থায়ী রূপ লাভ করে বা পুরুষানুক্রমে ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। বস্তুত, শিক্ষা এক পুরুষের আদর্শ, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে উত্তর পুরুষের মাঝে সঞ্চালন করে। সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় এটিই হচ্ছে সামাজিকীকরণ। সামাজিকীকরণের বহু পন্থা বিদ্যমান। এসব পন্থার মধ্যে শিক্ষা বা শিক্ষা ব্যবস্থা অধিক কার্যকরী ও বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তারকারী।

কোনো নবজাতককে সম্পূর্ণরূপে কোনো সামাজিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে সামাজিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। শিশুদের সামাজিকীকরণের ব্যাপারে স্বাভাবিকভাবেই সকল সমাজ ব্যবস্থাতেই বিশেষ যত্ন নেয়া হয় এবং এ বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সমাজের শিশু শিক্ষার্থী মাত্রই শিক্ষার মাধ্যমে নিজের সংস্কৃতিতে অধিষ্ঠিত হয় বা স্বীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকার লাভ করে। ব্যাপক অর্থে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রেক্ষিতে বলা যায়, শিখনের (Learning) মাধ্যমেই সম্পাদিত হয় সামাজিকীকরণ। যে কোন সামাজিক গোষ্ঠীর কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও আদর্শের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে সমাজের শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে। আর শিক্ষার সূত্রপাত হয় ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার (Interaction) মাধ্যমে। শিশুর জন্মের পর থেকে একেবারে শুরুতে শিক্ষার কোনো সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা থাকে না। শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ থাকে স্বত:স্ফূর্ত, সাবলীল। তবে পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সুপরিকল্পিতভাবে শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ শুরু হয়। এসব বিবিধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সর্বপ্রথম বিদ্যালয়ের শিক্ষার কথাই বলতে হয়। শিশু পরিবার ও সমবয়সী খেলার সাথীর পরই বিদ্যালয় থেকে শেখে। বিদ্যালয়েই প্রথশ শিশু সুপরিকল্পিতভাবে শিক্ষা গ্রহণ করে। অর্থাৎ শিশুকে সুশৃঙ্খলভাবে শিক্ষাদান করা হয়।

শিক্ষা সামাজিকীকরণকে সার্থক করে এবং শিক্ষার্থীর সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গোষ্ঠী জীবনে প্রচলিত সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে ব্যক্তিকে পরিচিত করার ক্ষেত্রে শিক্ষাই হলো সর্বাধিক কার্যকরী উপায়। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াকে সফল ও সার্থক করে তোলে সুপরিকল্পিত এবং সুপরিচালিত শিক্ষা ব্যবস্থা। সমাজস্থ সকল সদস্যের সামাজিকীকরণ যদি সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়, তাহলে সমাজ জীবন স্বচ্ছন্দ, সুসংগত, শান্তিপূর্ণ ও প্রগতিশীল হবার সম্ভাবনা থাকে। সমাজে ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সম্পাদিত হয় শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমেই। আর এ কারণেই সকল সমাজেই সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত ও যথাযথ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে।

শিল্প প্রধান সমাজে সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। আধুনিক কালের সমাজ হলো শিল্প প্রধান সমাজ। এ ধরনের সমাজে সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সুস্পষ্ট সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষায়তনের পরিকাঠামো, পাঠ্যক্রম ও বিভিন্ন সিদ্ধান্তের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংযোগ ও সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর থাকে। পরিবারের গন্ডী অতিক্রম করে শিশু যখন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তখন স্বাভাবিকভাবেই সমাজে তার ভূমিকার বিস্তৃতি ঘটে। বিদ্যালয়ের পরিবেশ শিশুর ওপর তখন প্রভাব বিস্তার করে এবং তার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে বিদ্যালয়ের সামাজিক পরিবেশে শিশুর নতুন সামাজিক শিক্ষা লাভ হয় এবং তার সামাজিকীকরণ ঘটে।

দেশ ও জাতি গঠনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। শিক্ষা যেহেতু 'জাতির মেরুদন্ড' এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'মানুষ গড়ার কারখানা' সেহেতু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিশুকে সঠিক শিক্ষা দান করে সুনাগরিক হতে সাহায্য করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রভাব শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহপাঠিদের সাথে মেলামেশা করে শিশু খাপ খাওয়ানের যোগ্যতা অর্জন করে এবং অন্যকে অনুকরণ করতে শেখে। বিশেষ করে শিক্ষকদের অনুকরণ করে। শিশুরা যাতে সামাজিক মূল্যবোধ, সামাজিক আদর্শ, সামাজিক অভ্যাসগুলো

আয়ত্ব করতে পারে সে জন্য প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সদা সচেষ্ট থাকে। উত্তম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এদিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শিশুর যাবতীয় মানবিক আচার-আচরণ ও সক্রীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগ ঘটে এবং সামাজিকীকরণ হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বিদ্যালয় পরিবেশেই শিশুর বা শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটে ও ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়। কাজেই যথাযথ সামাজিকীকরণের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম ও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. সামাজিকীকরণের অন্যতম মাধ্যম হলো–
   ক. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
   খ. গণশিক্ষা
   গ. সমাজ
   ঘ. বিদ্যালয়

২. সামাজিকীকরণ একটি–
   ক. আংশিক প্রক্রিয়া
   খ. সমাজ সংশ্লিষ্ট বিষয়
   গ. বুদ্ধিগত কৌশল
   ঘ. জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া

৩. সামাজিকীকরণ কোন ধরনের শিক্ষা?
   ক. রাজনৈতিক বিষয়
   খ. মনোবৈজ্ঞানিক শিক্ষা
   গ. সামাজিক শিক্ষা
   ঘ. মানসিক শিক্ষা

উত্তরমালা: ১. ক, ২. ঘ, ৩. গ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. সামাজিকীকরণ কী?
২. আরনল্ড গ্রীণের সামাজিকীকরণের সংজ্ঞাটি কী?
৩. সামাজিকীকরণের মাধ্যমসমূহ বর্ণনা করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. সামাজিকীকরণের মাধ্যম হিসেবে শিক্ষা কীভাবে ক্রিয়া করে ব্যাখ্যা করুন।
২. শিক্ষা ও সামাজিকীকরণের সম্পর্ক বর্ণনা করুন।

পাঠ ৭.২: শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়ন
Education and Social Development

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শিক্ষা কী তা বলতে পারবেন।
- সামাজিক উন্নয়ন বা অগ্রগতি বলতে কী বুঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষা কীভাবে সামাজিক অগ্রগতিকে তরান্বিত করে তা নির্ণয় করতে পারবেন।

শিক্ষা (Education)

'শিক্ষা' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো– 'Education'। যা ল্যাটিন শব্দ 'Educare' হতে উৎপত্তি বলে ধারণা করা হয় যায় অর্থ লালন-পালন করা। মানব সমাজের মৌলিক কার্যপ্রক্রিয়ার একটি হলো শিক্ষা। গ্রীক দার্শনিকদের কাছে শিক্ষা হলো এমন এক সুশৃঙ্খল ও সচেতন পদ্ধতি যা শিশুর সার্বিক বিকাশ সাধনের সাথে যুক্ত। সংকীর্ণ ও ব্যাপক দুই অর্থেই শিক্ষাকে বোঝানো হয়। সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা বলতে কেবল আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকেই বোঝায়। যা নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে, নির্দিষ্ট ও সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীকে শিক্ষণ বা পাঠদান করা। আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিখন শেখানো কার্যাবলিই মুখ্য বিষয়। তবে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কেবল পাঠদানই নয়, এর সাথে মানসিক অবস্থাকে বিকশিত করে তোলা এবং সাফল্যের সঙ্গে তাকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের উপযোগী করে গড়ে তোলা। অনুশীলনের মাধ্যমে আচরণের ইতিবাচক ও স্থায়ী পরিবর্তন সাধন করা। প্রকৃতপক্ষে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বলতে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাকেই বোঝায়। শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে নির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম অনুযায়ী লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যভিত্তিক পঠন-পাঠন, মূল্যায়ন পরিচালিত হয় আনুষ্ঠানিক শিক্ষায়।

ব্যাপক অর্থে শিক্ষা হলো মানুষের জীবনব্যাপী চলমান একটি প্রক্রিয়া। জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি এ প্রক্রিয়া চলমান থাকে। এ জাতীয় শিক্ষা কোনো সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের বিষয় নয়। এটি সমাজের মানুষের সামগ্রিক জীবন ধারার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি (Mackenzie)-এর মতে, ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলতে মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন বা আত্মোপলব্ধিকেই বোঝায়। তাঁর মতে, এই অর্থে শিক্ষা এক বিরামহীন প্রক্রিয়া যা আমৃত্যু অব্যাহত থাকে। মানুষের জীবনাপথে অর্জিত বহু অভিজ্ঞতার প্রতিটিই কোনো না কোনো শিক্ষালাভে সহায়তা করে। এ ধরনের শিক্ষা গ্রহণ প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে নিরন্তর চলতে থাকে। ফলে এ ধরনের শিক্ষা হলো একটি সাধারণ প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত মানুষ শিক্ষা অর্জন করে। যাকে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা বলা হয়। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা মানেই জীবন আর জীবনই শিক্ষা।

'শিক্ষা' ও 'উন্নয়ন' শব্দ দু'টি ঘনিষ্ঠভাবে একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত। এ দু'য়ের সম্পর্ককে সমান্তরাল (Parallel) হিসেবে গণ্য করা যায়। কেননা শিক্ষা ব্যতীত কোন ধরনের উন্নয়নই সম্ভব নয়। যে জাতি শিক্ষার আলোকে বেশী আলোকিত সে জাতিই উন্নয়নের শীর্ষে আরোহন করতে পারে। এ কারণেই বলা হয় "শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড"। শিক্ষা ব্যতীত কোন জাতি সমাজ বা ব্যক্তির কোন উন্নয়নই করতে পারে না। সামাজিক উন্নয়নের প্রথম ও প্রধান ধাপ হলো শিক্ষা। অনেকেই সামাজিক উন্নয়ন বা অগ্রগতিকে সামাজিক বিবর্তনের সাথে অভিন্ন মনে করে থাকেন। প্রকৃত পক্ষে এ দুটি বিষয় এক নয়।

শিক্ষা এমন একটি বহুমুখী সামাজিক প্রক্রিয়া যা মানুষের অস্তিত্বের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। এ প্রক্রিয়ায় মানুষ জন্ম হতে মৃত্যু অবধি প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করে থাকে। শিক্ষাই মানুষকে তার পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে শেখায়। শিশুর সুপ্ত সম্ভাবনাকে বিকশিত ও বাস্তবায়ন করে শিক্ষা। মানুষের জন্য শিক্ষার প্রয়োজনের তিনটি প্রধান কারণ হলো– (১) সঙ্গতি বিধান, (২) সংরক্ষণ ও (৩) অগ্রগতি সাধন। এ তিনটি প্রয়োজনের দিকে তাকালে সহজেই বুঝা যায়।

সামাজিক উন্নয়ন বা অগ্রগতির লক্ষণসমূহ

ব্যক্তি নিয়ে সমাজ গঠিত। ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। প্রত্যেক উন্নয়নের একটি অভীষ্ট লক্ষ্য থাকে যার দিকে সমাজ অগ্রসর হয়। এই অভীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে আদর্শ সমাজ। আর আদর্শ সমাজ বলতে আমরা সেই সমাজকে বুঝি যে সামজের ভিত্তি হবে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা। যে সমাজে মানুষ নিজেকে পূর্ণভাবে বিকশিত করার সুযোগ পাবে, সকল মানুষ ও সমাজে সকল প্রতিষ্ঠান জনকল্যাণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করবে। মোট কথা ব্যক্তি তার পার্থিব, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সকল দিক দিয়ে পূর্ণতা লাভ করতে পারবে এবং সমষ্টিগতভাবে সুখ লাভ করবে সকল শ্রেণির মানুষ। সমাজের উন্নয়ন ও গতিশীলতার জন্য সামাজিক মূল্যের সাথে নৈতিক মূল্যের একটা সংযোগ দরকার। কেননা নৈতিকতা ছাড়া যেমন ব্যক্তি জীবনের উন্নয়ন সম্ভব নয় তেমনি সমাজের অগ্রগতিও সম্ভব নয়। হার্বট স্পেন্সর মনে করেন যে, সামাজিক অগ্রগতি স্বত:সূত্রে ভাবেই সাধিত হয়। অন্যদিকে হব হাউস বলেন সামাজিক অগ্রগতির জন্য মানুষের ইচ্ছা থাকা দরকার। কেননা মানুষের ইচ্ছাই সমাজের পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রণ করে সমাজকে উন্নয়নে পথে এগিয়ে নেয়।

সামাজিক উন্নয়ন বা অগ্রতির লক্ষণ ঐক্য, শৃঙ্খলা, সমতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি। হব হাউস মনে করেন সামাজিক অগ্রগতির জন্য নৈতিক শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও উন্নয়ন অপরিহার্য শর্ত। কেননা সমাজের নৈতিক ভিত্তি মজবুত না হলে সমাজের অগ্রগতি সাধিত হতে পারে না। আবার উপযোগবাদীরা মনে করেন সমাজে যখন সর্বাধিক মানুষ সর্বোচ্চ পরিমাণ সুখ লাভ করতে পারে তখনই বুঝতে হবে সমাজের অগ্রগতি হয়েছে। গিনসবার্গ এর মতে সমাজের ব্যক্তিরা পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা সমাজে যে ঐক্য তৈরি করে সেটাই সামাজিক অগ্রগতির সূচনা করে। সামাজিক অগ্রগতির যে পরিচয় আমরা পেলাম তাতে দেখা যাচ্ছে, সমাজ বিজ্ঞানীগণ ঐক্য মতে পৌঁছাতে না পারলেও সামাজিক উন্নয়নের যে লক্ষণগুলোর কথা তারা বলেছেন তা থেকে আমরা বলতে পারি যে, ব্যক্তির তথা সমাজের উন্নয়নের পূর্ব শর্তই হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষা ব্যতীত নৈতিক উন্নয়ন বা মূল্যবোধ ধরে রাখা সম্ভব নয়, তেমনি সামাজিক শৃঙ্খলা, ঐক্য, সমতা বা অন্য যেসব বিষয়ের কথা বলা হচ্ছে তার সবকিছুকেই সম্ভব করে তুলতে পারে শিক্ষা।

সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা

শিক্ষা ব্যতীত ব্যক্তির উন্নয়ন কোন ভাবেই সম্ভব নয়, তেমনি সামাজিক উন্নয়নও সম্ভব নয়। কি পার্থিব জীবন, নৈতিক মূল্যবোধ গঠন ও সামাজিক মূল্যকে লালন পালন ও প্রতিষ্ঠা তথা জনকল্যাণ, সাম্য, ঐক্য, ভাতৃত্বসহ ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ এর সবকিছুর জন্য দরকার শিক্ষার আলোয় আলোকিত জীবন। শিক্ষা কীভাবে সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখে তার প্রধান প্রধান ক্ষেত্রগুলো নিচে তুলে ধরা হলো–

১. **নৈতিক অবক্ষয়রোধে শিক্ষা:** শিক্ষা ব্যক্তির মধ্যে যে মূল্যবোধগুলো তৈরি করে তার ফলে এক ধরনের নৈতিকতাবোধ ও সচেতনা বৃদ্ধি পায়। আর এ নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষা ছাড়া অর্জন সম্ভব নয়। নৈতিক শৃঙ্খল বা নৈতিক অবক্ষয় সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। যেমন– সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, খুন, ধর্ষণ, শিশু হত্যা ইত্যাদি। এসব সামাজিক সমস্যার সমাধান আইন প্রণয়ন করে যতটা না সমাধান করা যায় তার চেয়ে অনেক বেশী প্রয়োজন নৈতিক মূল্যবোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এ জন্য প্রয়োজন সঠিক শিক্ষা। শিক্ষার মধ্যে তথা

শিক্ষানীতিতে আদর্শ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে যা করণীয় তা অন্তর্ভুক্ত থাকলে এবং সুস্থ দেহে সুস্থমন তৈরি করতে পারলে নৈতিক অবক্ষয়রোধ করে একটা আদর্শ সমাজ গঠন করা যেতে পারে। সে জন্য প্রয়োজন জাতিকে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষাদান।

২. **সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে শিক্ষা:** সামাজিক উন্নয়নের প্রধান শর্তই হলো সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা। কাজটি যদিও ব্যক্তির ইচ্ছাধীন। তথাপি রাষ্ট্রীয়ভাবে ও শিক্ষার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। জীবনের শুরু থেকেই ব্যক্তিকে যদি পরার্থপরতার শিক্ষা ও পরোপকারী করে গড়ে তোলা যায় তাহলে পুরো জাতিই তা দ্বারা উপকৃত হবে। মনোভাব গঠন কাজে প্রাথমিক শ্রেণি হতে উচ্চ শ্রেণির শিক্ষায় এসব বিষয়বস্তু পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। শিক্ষাই পারে ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশের মাধ্যমে একজন সুনাগরিক ও সচেতন মানুষ গড়তে। আর শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারলে সমাজের উন্নয়নমূলক সকল কাজেই সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়।

৩. **সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় শিক্ষা:** সমাজের অগ্রগতির জন্য সমাজস্থ ব্যক্তিদের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকা একান্ত প্রয়োজন। অধ্যাপক বটোমোর বলেন, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে বুঝায় সামাজিক মূল্যবোধ ও আদর্শের ভিত্তিতে সমাজের মানুষের আচরণের নিয়ন্ত্রণ। এ নিয়ন্ত্রণ ছাড়া ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্কে গড়ে ওঠেতে না পারার ফলে সামাজিক অগ্রগতি সম্ভব হয় না। সামাজিক নিয়ন্ত্রণই ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক চেতনার সৃষ্টি করে যা সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে। ফলে গড়ে ওঠে নানা রকম সেবামূলক সংগঠন। আর এভাবে ব্যক্তির সামাজিকীকরণ সাধিত হলে গড়ে ওঠে এক উন্নতর সামাজিক শৃঙ্খলা। এ সবকিছুর মূলে কাজ করে ব্যক্তির শিক্ষা ও ব্যক্তিত্ব।

৪. **সামাজিক কল্যাণ ও বিশ্ব সমাজ প্রতিষ্ঠায় শিক্ষা:** ব্যক্তি শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণকে স্বীয় কল্যাণের সাথে অভিন্ন মনে করেন। ফলে সামাজিক অগ্রগতি দ্রুততার সাথে ঘটতে থাকে। সামাজিক অগ্রগতির জন্য ব্যক্তির এ দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব গড়ে তুলতে এবং তার পূর্ণ বিকাশে সহায়তা করে শিক্ষা। একজন শিক্ষিত সচেতন নাগরিকই ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সামাজিক স্বার্থ, এ সবের সীমানা পেরিয়ে বিশ্ব সমাজের সদস্য হিসেবে গণ্য করতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়। রেডক্রিসেন্ট, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা। এভাবে কালক্রমে মানুষ শিক্ষার বদৌলতে সমাজ চেতনার গন্ডি পেরিয়ে জাতীয় চেতনায় এমনকি জাতীয় চেতনার সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক কল্যাণ তথা বিশ্ব মানবতার কল্যাণে কাজ করার আদর্শকে ও প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.২

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ল্যাটিন শব্দ Educare-এর অর্থ হলো–
   ক. উন্নত করা
   খ. প্রতিপালন করা
   গ. বিকশিত করা
   ঘ. সবক'টি

২. শিক্ষার মাধ্যমে আচরণের কী ঘটে?
   ক. স্থায়ী পরিবর্তন
   খ. অস্থায়ী পরিবর্তন
   গ. অপেক্ষাকৃত বেশি স্থায়ী পরিবর্তন
   ঘ. কোনটিই না

৩. রুশোর মতে, শিক্ষার লক্ষ্য হলো–
   ক. সকল গুণের স্বাভাবিক বিকাশ সাধন
   খ. শিশুর বিকাশ সাধন
   গ. চরিত্র গঠন
   ঘ. শিশুর সামাজিক বিকাশ

৪. সামাজিক উন্নয়ন বা অগ্রগতির লক্ষণ কী?
   ক. সামাজিক ঐক্য
   খ. শৃঙ্খলা ও সহ-মর্মিতা
   গ. সহমত প্রদর্শন
   ঘ. সবগুলোই

৫. নৈতিক মূল্যবোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন–
   ক. পারস্পরিক সহযোগিতা
   খ. ভ্রাতৃত্ববোধ
   গ. সঠিক শিক্ষা
   ঘ. ধর্মীয় রীতি পালন

উত্তরমালা: ১. ঘ, ২. ক, ৩. ক, ৪. ঘ, ৫. গ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষা বলতে কী বুঝায়।
২. সামাজিক উন্নয়ন বা অগ্রগতি বলতে কী বুঝায়?।
৩. সামাজিক উন্নয়নের গতিকে শিক্ষা কতটুকু প্রভাবিত করে?
৪. সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা কী?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষাকে বিশ্লেষণ করে এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো লিখুন।
২. সামাজিক উন্নয়নের লক্ষণগুলো ব্যাখ্যা করুন।
৩. সামাজিক উন্নয়নের প্রধান ক্ষেত্রসমূহের বর্ণনা দিন।
৪. সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৭.৩: সংস্কৃতি ও শিক্ষা (সংস্কৃতি সংরক্ষণ, হস্তান্তর, সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, উপসংস্কৃতি, লোক সংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্যে সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।
- সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও হস্তান্তর উল্লেখ করতে পারবেন।
- সংস্কৃতির পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন।
- উপসংস্কৃতি, লোক সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সংস্কৃতি ও শিক্ষা (Culture and Education)

সংস্কৃতি ও শিক্ষা সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। একের সঙ্গে অন্যের যোগাযোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। অনেক ক্ষেত্রেই সংস্কৃতি ও শিক্ষাকে পৃথক করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। এই দুটো প্রত্যয় একটি অন্যটির সঙ্গে এমনভাবে মিশে থাকে বা একটি অন্যটি এমনভাবে বিলীন হয়ে যায় যে, এদের স্বতন্ত্ররূপে চিনে নেয়া কঠিন। শিক্ষা যেমন সংস্কৃতিকে গতিশীল রাখে, আবার সংস্কৃতিও তেমনি শিক্ষার দ্বারাই অর্জিত হয়। ফলে উভয়ই যেন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।

পূর্ব পুরুষের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া শিক্ষা-দীক্ষা, ভাবধারা, রীতি-নীতি, বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, জ্ঞান, কৌশল, দক্ষতা, দর্শন ইত্যাদিকে সংস্কৃতি (Culture) বলা হয়। সংস্কৃতির আরেক নাম 'সামাজিক উত্তরাধিকার' (Social Heritage)। সংক্ষেপে 'সংস্কৃতি' বলতে একটি মানবগোষ্ঠীর সমগ্র জীবন ধারাকে বোঝায়।

"Culture is the total way of life". এ হলো একটি মানবগোষ্ঠীর আচার-আচরণ, বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, আহার-বিহার, বিলাস-ব্যাসন, উপকরণ প্রভৃতি সবকিছুই। আর সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীব হিসেবে মানুষের ব্যক্তিত্বে উৎস মূলত দ্বিবিধ: একটি হলো জন্মগত ও অপরটি হলো সংস্কৃতিগত। অর্থাৎ সমাজ-সংস্কৃতির ওপর মানুষের ব্যক্তিত্ব অনেকাংশে নির্ভরশীল। বস্তুত, মানুষের ব্যক্তিত্বকে রূপায়ন করে তার সংস্কৃতি। মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠিত ও বিকশিত হয় তার সামগ্রিক সংস্কৃতিরই অংশ হিসেবে। মানুষের ব্যক্তিত্ব মূলত তার সংস্কৃতিরই ফল। আর শিক্ষার পরিধি প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবনেরই পরিধি। শিক্ষা ব্যক্তিত্ব গঠন করে, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়। শিক্ষা ব্যক্তিত্ব বিকাশের মাধ্যমে ব্যক্তির আচরণে অপেক্ষাকৃত ইতিবাচক স্থায়ী পরিবর্তন আনে। শিক্ষার দ্বারা মানুষ তার জ্ঞান ও দক্ষতার বিকাশ ঘটায় এবং দৃষ্টিভঙ্গীর পুনর্গঠন করে। এভাবে শিক্ষা মানুষের আচরণে পরিবর্তন আনে। মানুষের জীবনে তার সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। শিক্ষার সাহায্যেই মানুষ সেসব প্রভাবকে ইতিবাচকভাবে তার প্রয়োজনে কাজে লাগায়। আর আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গী ও অর্জিত দক্ষতার ওপর এমন একটি স্থায়ী পরিবর্তন আনার চেষ্টা করে যার মাধ্যমে সে সমাজের একজন সম্পূর্ণ মানুষে পরিণত হয়। সমাজে যে সব সাংস্কৃতিক আচার-আচরণ, অনুষ্ঠান, প্রথা, সামাজিক লোকাচার, মূল্যবোধ প্রচলিত সেগুলোর সংস্কার, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, উন্নয়ন এমনকি বর্জনের জন্যেও ব্যক্তিকে যথাযথ শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়।

শিক্ষা মানুষের আচরণের পরিবর্তন করে। আর মানুষের আচরণমালার সমষ্টিই হলো সংস্কৃতি।

সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও হস্তান্তর (Culture Conservation and Transmission)

মানুষ সংস্কৃতিবান প্রাণী। একমাত্র মানুষেরই সংস্কৃতি আছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ একটি সাংস্কৃতিক আবহে বাঁচে, সংস্কৃতির জন্ম দেয়। মানুষের সব ধরনের আচার-আচরণ, চিন্তা-কর্ম, সৃষ্টি সবই তার সংস্কৃতি। প্রতিটি সমাজের মানুষই তার সংস্কৃতি বহন করে। মানুষ যেমন সংস্কৃতি সৃষ্টি করে তা আবার সযত্নে লালন করে, বহন করে অর্থাৎ সংরক্ষণ করে এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আবার তা হস্তান্তর করে যায়। সমাজের দল বা গোষ্ঠী (Group) সংস্কৃতি বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সামাজিক রীতি-নীতি, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি বংশ পরম্পরায় বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন রয়েছে। সামাজিক দলই (Social Group) সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও পরবর্তী বংশধরদের কাছে তা হস্তান্তর করে থাকে। যেমন– পরিবার একটি সামাজিক দল বা গোষ্ঠী। প্রতিটি পরিবারের সদস্যরা সেই পরিবারের আচার-আচরণ, প্রথা পালনের মধ্যে দিয়ে তা সংরক্ষণ করে এবং পরবর্তী প্রজন্মকে যে সব পালন করতে শিখিয়ে বা শিক্ষা দিয়ে যায়। ফলে দুই পরিবারের সে সব আচার-আচরণ, প্রথা ইত্যাদির হস্তান্তর ঘটে। এভাবেই যুগ যুগ ধরে সামাজিক বিভিন্ন গোষ্ঠীর মাধ্যমে সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও হস্তান্তর চলতে থাকে। এই যে বংশ পরম্পরায় কোনো আচরণ শিখিয়ে দেয়া ও শিখে নেয়ার ব্যাপার চলতে থাকে এটিই শিক্ষা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ যে শিক্ষা গ্রহণ করেন তা তারা নিজের মধ্যে ধারণ বা সংরক্ষণ করেন এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে যেই শিক্ষা শিক্ষাদানের মাধ্যমে হস্তান্তর করেন। এভাবেই শিক্ষার মাধ্যমে সংস্কৃতি চলমান থাকে।

সাংস্কৃতিক পরিবর্তন (Cultural Change)

সমাজ পরিবর্তনশীল। সমাজ সব সময় একই অবস্থায় থাকে না। পরিবর্তনশীল সমাজের সংস্কৃতিও পরিবর্তনশীল। সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার সংস্কৃতিরও পরিবর্তন ঘটে। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত মানুষের সংস্কৃতি স্থান-কাল-পাত্রভেদে ধীরে ধীরে অথচ নির্দিষ্ট ধারায় পরিবর্তিত হয়ে আসছে। আমাদের পূর্ব পুরুদের পোশাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্তা, আচার-ব্যবহার থেকে আমাদের গুলো ভিন্নতর। সংস্কৃতির এই পরিবর্তন এককভাবে হয়নি, ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে পৃথক পৃথকভাবে এই পরিবর্তন এসেছে। আলোচনার সুবিধার জন্যে এই পরিবর্তনগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন–

১. অভ্যন্তরীণ উপাদান বা স্বতঃপ্রবৃত্ত উপাদানের পরিবর্তন।
২. বাহ্যিক উপাদান বা সান্নিধ্য দ্বারা আবিষ্ট পরিবর্তন।

অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলোর মধ্যে অস্তিত্বগত, অর্থনীতিগত প্রযুক্তিগত পরিবর্তনগুলো লক্ষ্য করা যায়। নব্যপ্রস্তরযুগীয় বিপ্লব, সাম্প্রতিক শতকের শিল্প বিপ্লব, বর্তমান বিশ্বের নগরায়নের ধারা এবং অসংখ্য ক্ষুদ্র পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্য এর অন্তর্ভুক্ত। বাহ্যিক পরিবর্তনগুলো জৈবিক প্রেরণার অন্তর্ভুক্ত। উত্থান-পতনশীল ফ্যাশন, অশান্ততা, সংগ্রাম, বিরক্তি, বিরোধিতা প্রভৃতি প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলো এই শ্রেণির অন্তর্গত।

অধ্যাপক মরিস জিন্সবার্গের মতে, 'সামাজিক পরিবর্তন বলতে সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনকে বোঝায়'। তিনি আরো মনে করেন, সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে যখন ব্যক্তির বিশ্বাস, মনোভাবের পরিবর্তন নিহিত থাকে সেটাই হচ্ছে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন।

উপসংস্কৃতি (Sub-Culture)

সংস্কৃতির একটি আলোচিত বিষয় হচ্ছে উপ-সংস্কৃতি (Sub-Culture)। সংস্কৃতি মানুষের জীবন যাত্রা প্রণালী ও আচার-আচরণের সমষ্টি হলেও দেশ-কাল-পাত্রভেদে সংস্কৃতির পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সাধারণ ভাষায় উপসংস্কৃতি বলতে বোঝায়, কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি যা বৃহত্তর সংস্কৃতি থেকে ভিন্নতর। কোনো দেশে

বা সমাজে বসবাসরত বৃহত্তর জাতি অপেক্ষা ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবন যাত্রা প্রণালীকে উপসংস্কৃতি বলে। মানব সমাজ বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত। এই স্তরবিন্যস্ত সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের বাস। এদের জীবন প্রবাহে তারতম্য আছে। আছে স্বাতন্ত্র। মানুষের জীবন প্রবাহের এই স্বাতন্ত্র্যকেই উপসংস্কৃতি বলে। উপসংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য যেসব ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় তা হলো ভাষা, চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, চাল-চলন, খাদ্যাভাস ইত্যাদি। বৃহত্তর সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে প্রাধান্য বিস্তারকারী সংস্কৃতির মৌলিক বিষয়বস্তু হতে স্বতন্ত্র প্রকৃতির সংস্কৃতিকে উপ-সংস্কৃতি বলা হয়। বৃহত্তর সমাজের এক একটি গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে ভিন্ন প্রকৃতির সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়। উপ-সংস্কৃতি সমাজের মূল সংস্কৃতির সাথে জড়িত থাকে এবং বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে মূল সংস্কৃতিকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করে। তবে সে নিজের স্বাতন্ত্র্যও বজায়ে রাখে। উপসংস্কৃতি হলো বৃহত্তর সমাজের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর সংস্কৃতি। অর্থাৎ সংস্কৃতির মধ্যে সংস্কৃতি।

লোক সংস্কৃতি (Folk Culture)

সংস্কৃতির একটি অন্যতম ধরণ হলো 'লোক সংস্কৃতি (Folk Culture)'। লোক সংস্কৃতি হচ্ছে এমন এক ধরনের সংস্কৃতি যা লোকায়ত সমাজের সংস্কৃতি। লোক সংস্কৃতি মূলত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর লোকায়ত মানুষের জীবন ধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক সংস্কৃতি। লোক সংস্কৃতি হচ্ছে এমন এক ধরনের সংস্কৃতি যা গ্রামীণ মানুষের হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, বিনোদন তথা সার্বিক জীবনের এক প্রতিচ্ছবি যা তাদের মধ্যে থেকেই উদ্ভব এবং তাদের দ্বারাই গ্রহণযোগ্য ও সমাদৃত। লোক সংস্কৃতি গ্রামীণ জনপদের মানুষের সঙ্গে গভীরভাবে মিশে আছে। একটি গ্রামীণ জনগণের ব্যবহার ও চর্চার মাধ্যমে গড়ে ওঠা তাদের এক নিজস্ব জীবন পদ্ধতি। লোক সংস্কৃতি মূলত গ্রামীণ জীবন নিয়ে গড়ে ওঠা লোক ঐতিহ্য নির্ভর এক স্বাতন্ত্র্য সংস্কৃতি। লোক সংস্কৃতি প্রধানত ঐতিহ্য নির্ভর। পৈত্রিক সম্পত্তির মতোই এগুলো বিনা দ্বিধায়, বিনা বিচারে লোকায়ত মানুষ গ্রহণ করে ও পালন করে। গভীর অনুধ্যান ও অনুশীলন কম বলে লোক সংস্কৃতি কিছুটা স্থূল ও জটিলতাহীন। স্থূলতা ও গতানুগতিকতা এর বৈশিষ্ট্য। লোক সংস্কৃতি অকৃত্রিম। স্বভাব ও প্রবৃত্তির ছাপ এতে বেশী। তাই কোনো দেশের কোনো জাতির মৌলিকতা ও স্বকীয়তার পরিচয় সে দেশের লোক সংস্কৃতিতে খুঁজে পাওয়া যায়।

সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য (Cultural Diversty)

প্রত্যেক সংস্কৃতিরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। এক সংস্কৃতির সঙ্গে অন্য সংস্কৃতির পার্থক্য থাকে যৌক্তিক কারণে। একটি সংস্কৃতির স্বরূপ নির্ধারিত হয় তার পারিপার্শ্বিকতা, আবহাওয়া, প্রযুক্তি, জনসংখ্যা এবং ভৌগোলিক অবস্থান দ্বারা। এসব নিয়ামকসমূহের প্রতিফলন ঘটে মানুষের আচার-ব্যবহার, মূল্যবোধ ও ভাষার ওপর। সব সংস্কৃতির অভিন্ন অনেক বৈশিষ্ট্য থাকলেও সংস্কৃতিতে ভিন্নতা বা বৈচিত্র্যও দেখা যায়। গোষ্ঠীভেদে সংস্কৃতির মধ্যে বৈচিত্র্য থাকাটাই স্বাভাবিক। কারণ সংস্কৃতি হলো মানুষের অর্জিত বিষয়, সহজত নয়। এক একটি জাতির, গোষ্ঠীর, অঞ্চলের বা ইতিহাসের এক একটি অধ্যায়ের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সংস্কৃতির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এ কারণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের স্বতন্ত্র সংস্কৃতির কথা বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৩

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. শিক্ষা ও সংস্কৃতির সম্পর্ক হলো–
   ক. অবিচ্ছেদ্য
   খ. চিরন্তন
   গ. সাপেক্ষ
   ঘ. অভিন্ন

২. শিক্ষা কী গঠন করে?
   ক. রাষ্ট্র
   খ. নাগরিকত্ব
   গ. চরিত্র
   ঘ. ব্যক্তিত্ব

৩. শিক্ষার পরিধি প্রকৃতপক্ষে জীবনের–
   ক. পরিধি
   খ. সুখ
   গ. মূল্য
   ঘ. উন্নয়ন

উত্তরমালা: ১. ক, ২. ঘ, ৩. ক

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সংস্কৃতির হস্তান্তর কী?
২. লোক সংস্কৃতি কাকে বলে?
৩. উপ-সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায়?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. সংস্কৃতি ও শিক্ষা কিভাবে সম্পর্কিত বর্ণনা করুন।
২. সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও হস্তান্তর ব্যাখ্যা করুন।
৩. সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, লোক সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

পাঠ ৭.৪: উদ্ভাবন ও শিক্ষা
Innovation and Education

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- উদ্ভাবন কী তা বলতে পারবেন।
- শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্ভাবন কী তা বলতে পারবেন।
- উদ্ভাবন প্রক্রিয়ার বৈশিষ্টগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।
- উদ্ভাবন বাস্তবায়নে মৌলিক বিষয়গুলো উল্লেখ করে এর সফলতাগুলো প্রতিবন্ধকতা ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্ভাবনী উদ্যোগগুলো চিহ্নিত করে নতুন উদ্ভবনী উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবেন।

ভূমিকা

উদ্ভাবনের ধারণা, শিক্ষা ক্ষেত্রে উদ্ভাবন, উদ্ভাবন প্রক্রিয়ায় বৈশিষ্ট, উদ্ভাবন প্রক্রিয়ায় কারা কিভাবে জড়িত, উদ্ভাবন বাস্তবায়বনে মৌলিক বিষয়, উদ্ভাবনের প্রতিবন্ধকতা, উদ্ভাবনে সফলতার উপায়, শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্ভাবন ও করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

উদ্ভাবনের ধারণা

শাব্দিক অর্থে Innovation-এর বাংলা প্রতিশব্দ উদ্ভাবন, নতুনরীতি, নবধারা, নবপ্রবর্তিত। উদ্ভাবন বা ইনোভেশন-এর ধারণাটি মূলতঃ বেসরকারি খাত থেকে এসেছে। এর সংজ্ঞা, প্রয়োগ ও পরিব্যপ্তি নিয়ে তাত্ত্বিকগণের বিভিন্ন মত ও পর্যালোচনা রয়েছে। উদ্ভাবন প্রত্যয়টির প্রয়োগ এবং সংজ্ঞা উভয়ই প্রাসঙ্গিক বিষয় বা পরিপ্রেক্ষিত কেন্দ্রিক।

Business Dictionary-তে ইনোভেশনকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে- "The process of translating an idea or invention into a good or service that creates value or for which customers will pay".

Myriam Webmaster-এর সংজ্ঞা মতে- a new idea, device, or method: the act or process of introducing new ideas, devices, or methods.

আইডিইও (www.ideo.org)-এর মতে, উদ্ভাবন বলতে কোন পণ্য বা পদ্ধতি বা সেবার উন্নয়ন বা অভিযোজন বা প্রবর্তন বোঝায় যা জনগণের জন্য নতুন সুবিধা বা উপকার তৈরি করে। সার্বিক ভাবে বলা যায় উদ্ভাবন হল, একটা ভাবনা বা উদ্ভাবিতব্যকে একটি পণ্য বা সেবায় পরিবর্তনের প্রক্রিয়া যা মূল্য সৃষ্টি করে বা যার জন্য গ্রাহক মূল্য পরিশোধকরে।

শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্ভাবন

শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্ভাবন হল শিক্ষন-শিখন প্রক্রিয়ায় প্রচলিত পদ্ধতি, উপকরণ, সেবা প্রভৃতি বিষয়ে গুণগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষা মাধ্যম, শিক্ষা সেবা পদ্ধতির উন্নয়ন, অভিযোজন বা প্রবর্তন করা কে বুঝায়।

আবাকাস এর উদ্ভাবন থেকে স্টীভ জবসের ম্যাকিন্টোস কম্পিউটারের হাত ধরে আজকের ল্যাপটপ ও আইফোন এই সবগুলোই উদ্ভাবন। বাংলাদেশে মোবাইল ফোনের আগমনের ফলে মোবাইল ফোনে শিক্ষা উপকরণ দেখার সুযোগ ও অর্থনৈতিক লেনদেন এর উদ্ভাবন হল শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যুগান্তকারী উদ্ভাবন।

উদ্ভাবন প্রক্রিয়ায় বৈশিষ্ট্য

- ইনোভেশন বা উদ্ভাবন হচ্ছে চলমান প্রক্রিয়া।
- এই প্রক্রিয়ায় নতুন নতুন ধারণা প্রয়োজন হয়।
- সেবা, উপকরণ বা পদ্ধতি উন্নয়ন করা।
- উদ্ভাবনের গুণগত ও টেকসই উন্নয়ন করা।
- উদ্ভাবনী উদ্যোগ সম্পৃক্ত জনগণের সেবার মূল্যমান পরিশোধের আকাঙ্ক্ষা তৈরী করা।

উদ্ভাবন প্রক্রিয়ায় কারা, কিভাবে জড়িত

- ক্রিয়েটিভ চিন্তাশীলরা আইডিয়ার উন্নয়ন করে।
- এন্টারপ্রেনাররা রশদ যোগায়।
- রেগুলেটররা নীতিমালা দিয়ে সাপোর্ট দেয়।
- সরকার চূড়ান্তভাবে সেটাকে বাস্তবায়নে সহায়তা করে।

উদ্ভাবন বাস্তবায়বনে মৌলিক বিষয়

- উদ্ভাবনী উপায়ে চিন্তা ভাবনা করা। বাক্সের বাইরে চিন্তা জগতকে বিস্তৃত করা।
- অন্যদের কথা সৃজনশীলভাবে গুরুত্ব সহকারে শোনা।
- পড়াশোনার মাধ্যমে নতুন জ্ঞানের উন্নয়ন করা।
- উদ্ভাবনী উদ্যোগের জন্য নীতিনির্ধারক দ্বারা সৃজনশীল নীতিমালা প্রনয়ন করা।
- সুশাসনের মাধ্যমে অদম্য ও প্রগতিশীল উদ্ভাবন বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়ন নিশ্চিত করা।
- উন্নয়নশীল দেশে উদ্ভাবনী পরিবেশ ও সংস্কৃতি উদ্ভাবনের জন্য বড় ভূমিকা পালন করে।

উদ্ভাবনের প্রতিবন্ধকতা

উদ্ভাবনের প্রধান প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে ঐতিহ্যগত স্থিতাবস্থা প্রবণতা এবং ঝুঁকি বিমুখতা। কাজে পূর্ববর্তীতাকে অনুসরণ করা হয় আর সুনির্দিষ্ট নিয়ম-পদ্ধতি মেনে চলা হয়। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম এবং ব্যর্থতাকে নিরুৎসাহিত করা হয়। নিয়ম মাফিক রুটিন কাজ করতে অভ্যস্ত এবং অধিকতর সচ্ছন্দ; যা ব্যতিক্রমী উদ্যোগ গ্রহণকে বাধাগ্রস্থ করে। এছাড়া ঝুঁকি গ্রহণে সাহসিকতা এবং সফল উদ্ভাবনী উদ্যোগের জন্য পৃথক কোন প্রণোদনার ব্যবস্থা না থাকা। উদ্ভাবন বিষয়ক এক গবেষণায় এ সংক্রান্ত নিম্নোক্ত প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে-

- সম্পদের অপ্রতুলতা।
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সমর্থনের অভাব।

- নতুন উদ্যোগে বাধা প্রদান।
- সেবা গ্রহিতার অজ্ঞতা বা পশ্চাৎপদতা।
- আইনগত জটিলতা এবং
- ঝুঁকি গ্রহণ না করার প্রবণতা।

উদ্ভাবনে সফলতার উপায়

যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং এর মাধ্যমে কাঙ্খিত শিক্ষা সেবাকে মানসম্মত পর্যায়ে নেয়া সম্ভব। উদ্ভাবনে সফলতার প্রধান উপায়গুলো হচ্ছে-

- শিক্ষা সুবিধা বৃদ্ধির আকাঙ্খা আর উদ্ভাবনী উদ্যোগে জনসম্পৃক্তির মানসিকতা।
- যোগ্য ও কার্যকরী নেতৃত্ব।
- উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সমর্থন ।
- উদ্ভাবন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা।
- ঝুঁকি গ্রহণের মানসিকতা।
- উদ্ভাবনী ব্যর্থতাকে সহজভাবে গ্রহণ করা।
- প্রণোদনার ব্যবস্থা রাখা, হোক তা আর্থিক বা অন্য যে কোন ধরণের স্বীকৃতি।

শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্ভাবন ও করণীয়

বর্তমান বিশ্বে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর মধ্যে ই-লার্নিং, ভার্চুয়াল ইউনিভার্সিটি, ভার্চুয়াল ক্লাসরুম, বৈশ্বিক শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর দোরগোরায় নিয়ে এসেছে। বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রেও উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নের চর্চা শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে চলমান উদ্ভাবনী উদ্যোগগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল–

- **শিক্ষক বাতায়ন**

শিক্ষকদের শিক্ষামূলক বিনিময়ের একটি প্লাটফর্ম হল শিক্ষক বাতায়ন www.teacher.gov.bd এখানে সারাদেশের শিক্ষকরা তাদের তৈরি করা ডিজিটাল কন্টেন্ট বিনিময় করতে পারেন, নিজেদের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে মতামত দিতে পারেন।

- **মুক্তপাঠ**

শিক্ষকদের অনলাইন প্রশিক্ষণের এটি একটি উন্মুক্ত প্লাটফর্ম হল মুক্তপাঠ www.muktopaath.gov.bd এখানে শিক্ষকরা অনলাইনে বিভিন্ন পেশা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ বিনামূল্যে পেয়ে থাকেন ।

- **মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট**

বাংলাদেশ আইটিটি বিভাগ ও ব্রাকের সহায়তায় প্রাথমিক শিক্ষার ইন্টারএক্সক্টিভ মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট তৈরী করেছে। এই কন্টেন্ট দিয়ে শিক্ষার্থীরা নিজে নিজে শিখতে পারে। http://digitalcontent.ictd.gov.bd/ এছাড়াও এনসিটিবি স্বল্প পরিসরে ইন্টারএক্সটিভ মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট তৈরীর কাজ শুরু করেছে।

- **বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়**

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। এখানে একজন শিক্ষার্থী দূর শিক্ষণের মাধ্যমে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারে। শিক্ষার্থীরা বাড়িতে বসে অনলাইনে ভর্তি থেকে শুরু করে ক্লাসে অংশগ্রহণ, মূল্যায়ন ও সনদ গ্রহণ করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৪

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ইনভেশনের বাংলা প্রতিশব্দ কোনটি–
ক. উদ্ভাবন
খ. নতুননীতি
গ. আবিষ্কার
ঘ. নবপদ্ধতি

২. শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্ভাবন বলতে কি বোঝায়?
ক. শিক্ষায় নতুন কিছু আবিষ্কার
খ. শিক্ষায় নতুন কিছু তৈরি করা
গ. শিক্ষা সেবা পদ্ধতির উন্নয়ন, অভিযোজন বা প্রবর্তন
ঘ. কোনটিই নয়

৩. নিচের কোনটি উদ্ভাবন প্রক্রিয়ায় সরাসরি জড়িত নয়–
ক. সৃজনশীল চিন্তাবিদ
খ. উদ্যোক্তা
গ. নীতিনির্ধারক
ঘ. শিক্ষা মন্ত্রণালয়

৪. উদ্ভাবনের প্রধান প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে–
ক. সুনির্দিষ্ট নিয়ম-পদ্ধতি মেনে চলা
খ. ব্যতিক্রম এবং ব্যর্থতাকে নিরুৎসাহিত করা
গ. নিয়ম মাফিক রুটিন কাজ করতে অভ্যস্ত এবং অধিকতর সচ্ছন্দ
ঘ. ঐতিহ্যগত স্থিতাবস্থা প্রবণতা এবং ঝুঁকি বিমুখতা

৫. শিক্ষাক্ষেত্রে কোথায় উদ্ভাবনের সুযোগ রয়েছে কীভাবে বুঝবেন?
ক. কাঙ্ক্ষিত ও প্রচলিত শিক্ষা সেবার মধ্যে পার্থক্য দেখা গেলে
খ. শিখন প্রক্রিয়ায় সমস্যা দেখা গেলে
গ. শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে
ঘ. নতুন শিক্ষা প্রযুক্তির উদ্ভাবন হলে

উত্তরমালা: ১. ক, ২. গ, ৩. ঘ, ৪. ঘ, ৫. ক

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. উদ্ভাবন কাকে বলে?
২. উদ্ভাবন প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট গুলো উল্লেখ করতে পারবে।

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. উদ্ভাবন ও শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্ভাবন ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন।
২. উদ্ভাবন প্রক্রিয়ার মৌলিক বিষয়গুলো চিহ্নিত করে এর প্রতিবন্ধকতার বর্ণনা করুন।
৩. শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্ভাবনগুলো চিহ্নিত করে আপনার করণীয় সম্পর্কে মতামত দিন।

পাঠ ৭.৫: সামাজিক পরিবর্তন ও অভিযোজন
Social Change and Adaptation

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সামাজিক পরিবর্তন কী তা বলতে পারবেন।
- সামাজিক পরিবর্তনের কারণসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- সামাজিক পরিবর্তন বিশ্ব সংস্কৃতিতে কিভাবে প্রভাব ফেলে তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- সামাজিক পরিবর্তন অভিযোজন প্রক্রিয়ায় কি ভূমিকা রাখতে পারে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সামাজিক পরিবর্তন কিভাবে সাংস্কৃতিক ব্যবধান তৈরি করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমিকা

সমাজ স্বভাবতই গতিশীল ও পরিবর্তনশীল। সমাজের বর্তমান অবস্থা থেকে পূর্বের অবস্থার পার্থক্যকেই সামাজিক পরিবর্তন বলা হয়। পরিবর্তন দ্বারাই মানব সমাজ আদি বর্বর অবস্থা অতিক্রম করে আধুনিককালের সভ্য অবস্থায় উপনীত হয়েছে। বিবর্তনের মাধ্যমেই আদিম সাম্যবাদী সমাজ চরম পুজিবাদী সমাজের রূপান্তরিত হয়েছে।

সামাজিক পরিবর্তনের সংজ্ঞা

সাধারণভাবে বলা যায় যে, সমাজের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় স্থায়ী বা আপেক্ষিক রূপান্তরকেই সামাজিক পরিবর্তন বলা হয়। বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানী সামাজিক পরিবর্তনকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। নিম্নে কয়েকজন সমাজ বিজ্ঞানী কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হলো–

Karl Marx-এর মতে, "সমাজের উৎপাদন প্রণালীর পরিবর্তনই সামাজিক পরিবর্তন"।
Morris Ginsberg-এর মতে, "সামাজিক পরিবর্তন হল সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন উদাহরণস্বরূপ সমাজের আকার সংঘের ভারসাম্য ও গঠনের অংশগত ধারণ"।
Herbert Spancer-এর মতে, "সমাজের অনির্দিষ্টতা থেকে সুনির্দিষ্টতা, সমজাতীয়তা থেকে অসমজাতীয়তা এবং সহজ থেকে জটিলতার দিকে পদার্পনকেই সামাজিক পরিবর্তন বলা হয়"।
Roserts-এর মতে, "সামাজিক পরিবর্তন হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সামাজিক ব্যবস্থার কাঠামো এবং ক্রিয়ার পরিবর্তন হয়"।
Samuel Koenig-এর মতে, "সামাজিক পরিবর্তন বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে যা মানুষের জীবনযাত্রার পরিবর্তন ঘটায়"।
Ronald Robertson-এর মতে, "সময়ের ব্যবধানে সামাজিক আচরণ, সামাজিক অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান এবং সর্বোপরি সমাজ কাঠামোর ধরনের মধ্যে যে রদবদল ঘটে তার নামই সামাজিক পরিবর্তন"।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোর বিশ্লেষণ দেখা যায় যে, সামাজিক পরিবর্তন বলতে বুঝায়-

– সামাজিক পরিবর্তন যুগেরভিত্তিতে আচরণের মধ্যে পরিবর্তন।
– সামাজিক পরিবর্তন সমাজ কাঠামোর ধরণের পরিবর্তন।

– সামাজিক প্রথা, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরিবর্তন।
– জীবন ধারার পরিবর্তন।
– সামাজিক ক্রিয়ার পরিবর্তন।
– উৎপাদন প্রণালী পরিবর্তন ইত্যাদি।

সামাজিক পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য

সামাজিক পরিবর্তনের নিম্নোক্ত বৈশিষ্টগুলি লক্ষ্য করা যায়। যথা–

ক. **সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে একটা সর্বজনীন প্রপঞ্চঃ** সকল সমাজেই পরিবর্ধন সংঘটিত হয়। প্রত্যেক সমাজের মধ্যে রয়েছে কতক গতিশীল উপাদান। সমাজে জনসংখ্যার কাঠামো পরিবর্ধন হয়, প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ঘটে, বস্তুগত উপাদানের রূপান্তর হয় এবং মূল্যবোধ ও ভাবাদেশের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসে।

খ. **সামাজিক পরিবর্তন একটা অপরিহার্য নিয়মঃ** পরিবর্তন প্রকৃতির নিয়মাধীন। সামাজিক পরিবর্তন একটি স্বাভাবিক ঘটনা। এটি স্বাভাবিকভাবে কিংবা পরিকল্পিত প্রচেষ্টার ফলে সংগঠিত হতে পারে।

গ. **সামাজিক পরিবর্তনের গতি অসমঃ** সকল সমাজেই পরিবর্তন ঘটে কিন্তু এর গতি সর্বত্র সমান নয়। অধিকাংশ সমাজেই পরিবর্তনের গতি মন্থর, যা অনেকের দৃষ্টিগোচর হয় না। গ্রামের তুলনায় শহরের পরিবর্তন অধিকতর দ্রুত হয়।

ঘ. **সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যত বাণী করা অসম্ভবঃ** সামাজিক পরিবর্তনের ধরণ কি হবে সে সম্পর্কে ভবিষ্যতবাণী করা যায় না। সামাজিক পরিবর্তনের এমন কোন অন্তর্নিহিত সূত্র নেই যার ফলে ধারণা এর একটা সুনির্দিষ্ট রূপ আছে। এটা বলা যায় না আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, ধ্যান-ধারণা, নীতি আদর্শ ও মূল্যবোধ ভবিষ্যতে কি রূপ ধারণ করবে।

ঙ. **সামাজিক পরিবর্তন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ধারাবাহিকতাঃ** সমাজ ব্যবস্থায় রয়েছে বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক গতিশীল সম্পর্ক। সে জন্য সমাজের কোন অংশের পরিবর্তন ঘটলে স্বাভাবিকভাবে এর অন্য অংশের উপর প্রভাব পড়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আধুনিক শিল্পায়ন কুটির শিল্পের অস্তিত্বের জন্য হুমকি স্বরূপ।

চ. **সামাজিক পরিবর্তনের গতি প্রকৃতি সময় নির্ভরঃ** একই সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তনের গতি একরূপ নয়। যেমনঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সূর্য ও স্বাধীনতা পরবর্তী সামাজিক পরিবর্তনের গতির তারতম্য রয়েছে।

অর্থাৎ সময় এখানে একটি বড় ফ্যাক্টর।

সামাজিক পরিবর্তনের কারণসমূহ

মানব সভ্যতার সকল সমাজে ও সকল যুগে সামাজিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সামাজি পরিবর্তনের গতির ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। সামাজিক পরিবর্তনের গতি ও দিক নির্দেশনার ক্ষেত্রে কতগুলো উপাদান ক্রিয়াশীল। সামাজিক পরিবর্তন এসব উপাদানের জন্যই সামাজিক পরিবর্তন ঘটে। যথা–

১. **জৈবিক উপাদানঃ** সামাজিক পরিবর্তনের জৈবিক উপাদানসমূহের ভিতর রয়েছে প্রাণী ও বৃক্ষরাজি এবং স্বয়ং মানুষ। জৈবিক পরিবেশ মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে প্রভাবিত করে। জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির সমাজব্যবস্থার উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। জনসংখ্যার সংখ্যাগত পরিবর্তন যেমন সামাজিক পরিবর্তনের উপর প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করে তেমনিভাবে সামাজিক পরিবর্তনও জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির বিষয়টিকে প্রভাবিত করে। সমাজ জীবনের বিভিন্ন বিষয়কে প্রভাবিত করে জনসংখ্যার আয়তন।

২. **সাংস্কৃতিক উপাদান:** মানব সমাজের জীবনাচারনের সমষ্টি হলো সংস্কৃতি। সংস্কৃতি মানব সমাজের সামগ্রিক পরিচয় বহন করে। সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তনকে অনিবার্য করে তোলে মানুষের চিন্তা চেতনা, ধ্যান-ধারণা, ন্যায়, নীতিবোধ, আদর্শ, মূল্যবোধের দ্বারা। প্রযুক্তির প্রকৃতি ও গতিপথ নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় সমকালীন সংস্কৃতির দ্বারা।

৩. **প্রাকৃতিক উপাদান:** প্রাকৃতিক উপাদান যেমন: ভূমিকম্প, বন্যা, ঝড়-বৃষ্টি, নদী-ভাঙ্গন ইত্যাদি সামাজিক অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রকৃতিবাদীদের মতবাদের প্রবক্তাদের মতে মানব সমাজের বিকাশের জন্য প্রধানত প্রাকৃতিক উপাদানই দায়ী। সভ্যতার বিকাশের প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রতিকূল ও অনুকূল উভয় ধরনের ভূমিকাই পালন করতে পারে। পরিবেশ থেকে প্রাপ্ত সম্পদের সদব্যবহারের মাধ্যমেই সভ্যতার বিকাশ ঘটে।

৪. **অর্থনৈতিক উপাদান:** অর্থ ব্যবস্থা হল সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম সংগঠন। সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের ব্যবহারিক জীবন অর্থনৈতিক উপাদানের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। সমাজ সম্পর্কে ব্যক্তি মানুষের মনোভাব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান নিয়ামক শক্তি হল অর্থনৈতিক কার্যকলাপ। মানব সমাজের বিভিন্ন স্তরে সক্রিয়ভাবে বর্তমান থাকে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব। সমাজে প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের জীবনধারা, জীবনদর্শন, মানসিকতা, মূল্যবোধ প্রভৃতিকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে।

৫. **মনস্তাত্ত্বিক উপাদান:** সমাজব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব বিদ্যমান থাকে। কালের বিবর্তনের সাথে সাথে সমাজবদ্ধ মানুষের নীতিজ্ঞান, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, সনাতন হিন্দু সমাজের সতীদাহ প্রথা বর্তমানে অমানবিক অনৈতিক ও পাশবিক বলে বিবেচিত হচ্ছে এবং পরিত্যাক্ত হয়েছে। অনুকরণ প্রবণতা হলো মানুষের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এই প্রবণতার দ্বারা মানুষ অন্য সমাজের বিধি, ব্যবস্থা-আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতি অনুস্মরণ করতে উদ্যোগী হয়। তাছাড়া মানুষের নতুনত্বের প্রতি আকর্ষণ অনস্বীকার্য। মানব সমাজের নতুনত্বের প্রতি এই কদর প্রচলিত অবস্থার পরিবর্তন রুচি বোধের পরিবর্তন ঘটায়। ফলে প্রচলিত সমাজ জীবনের পরিবর্তন ঘটে।

সামাজিক পরিবর্তন একটা চলমান গতিশীল প্রক্রিয়া। সমাজভেদে সামাজিক পরিবর্তনের গতি ও মাত্রার পার্থক্য দেখা যায়। সমাজবিজ্ঞানী 000-এর মতে সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ৮টি উপাদান প্রভাবক হিসাবে কাজ করে। যথা–

১. ব্যক্তির সচেতন উদ্দেশ্য ও তার সিদ্ধান্ত।
২. ব্যক্তির ভূমিকা ও কার্যাবলি যা পারিপার্শ্বিক অন্যান্য উপাদান দ্বারা প্রভাবিত।
৩. বাহ্যিক প্রভাব। যেমন সাংস্কৃতিক যোগাযোগ যুদ্ধে জয়।
৪. কাঠামোগত পরিবর্তন যা উৎপাদন শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে পরিবর্তন আনে।
৫. প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব বা গোষ্ঠীর প্রভাব।
৬. উপনিবেশিক শাসন ও তাদের প্রভাব।
৭. বিভিন্ন আর্থ-রাজনৈতিক উপ-দানের ঘাত-প্রতিঘাতে কোন বিশেষ বিপ্লব।
৮. গোষ্ঠীর কোন বিশেষ সাধারণ ইচ্ছার উন্মেষ যেমন-উন্নতির জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ জনগোষ্ঠী...।

সামাজিক পরিবর্তন ও অভিযোজন প্রক্রিয়া

মানুষ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষালাভ করে সমাজের একজন সদস্য হিসাবে নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তোলে। তাই সমাজবিজ্ঞানীগণ সামাজিকীকরণের অন্যতম প্রধান বাহন হিসাবে শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যেমন–

ক. রুশোর মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুর সহজাত প্রবৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ সাধন।

খ. কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তক জার্মান শিক্ষাবিদ জন ফ্রেডারিক ফ্রয়েবেল বিশ্বাস করতেন শিক্ষার লক্ষ্য হলো একটি পরিপূর্ণ জীবন।

গ. জোহান হেনরিক পেস্তালোৎজি-এর মতে শিক্ষার লক্ষ্য মানবিক গুণাবলির সর্বাঙ্গীন বিকাশ যা পরিনামে জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে সহায়ক হবে।

ঘ. জন ডিউই: শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে সুষ্ঠু জীবন যাপন।

ঙ. হার্বার্ট স্পেনসার: শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির সমাজ জীবনে পূর্ণতা আসে।

চ. অগাস্ট কোৎ: সমাজের সদস্যদের ভিতর পারস্পরিক সহানুভূতি ও উপলব্ধির বিকাশ সাধনই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য।

ছ. সামনার: শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির যুক্তিশীল মানসিক শক্তির বিকাশ ঘটাবে যার মাধ্যমে সে সমাজ জীবনে আবেগের বশবর্তী হয়ে কোন কাজ করার চেয়ে বিচার বিবেচনা করে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হবে।

জ. গিডিংসের মতে, শিক্ষা মানুষকে অবজ্ঞা ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত রাখতে পারবে এবং একজন আলোকিত নাগরিক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে।

মানব শিশু একটি পরিবারে জন্মগ্রহণের মাধ্যমে সমাজের হয়ে সংশ্লিষ্ট সমাজের প্রচলিত শিশু জন্ম মুহূর্তে সে নিয়ম রীতির সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে প্রয়াস পায়। সে উক্ত সামাজিক পরিবেশে বড় হতে থাকে। সে যতই বড় হতে থাকে ততই সে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও পরিবর্তনশীল সমাজের সংস্পর্শে আসে। ভিন্ন ভিন্ন সমাজের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে নির্দিষ্ট কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে প্রবৃত্ত হয়। শিক্ষার মাধ্যমে জীবন প্রণালী গ্রহণের মানসিকতা তৈরি হয়। তাই শিক্ষা সমকালীন বিশ্বে যে কোন সমাজের ব্যক্তিকে পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করে। শিক্ষার মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম সামাজিক মূল্যবোধ ও আদর্শ সম্পর্কে অবহিত হয়।

সামাজিক পরিবর্তন ও সাংস্কৃতিক ব্যবধান

সমাজবিজ্ঞানী W. F. Orburn তাঁর Social Change গ্রন্থে সাংস্কৃতিক ব্যবধান (Cultural lag) তত্ত্বটি প্রদান করেছেন। তার তত্ত্বের মূল সূর হলো– পরিবর্তনশীল সমাজের বস্তুগত সংস্কৃতির যে গতি ও হারে বৃদ্ধি পায় আদর্শগত সংস্কৃতি সে তুলনায় অনেক ধীরে এগোতে থকে। ফলে উভয় ধরনের সংস্কৃতির মধ্যে একটা ব্যবধান সৃষ্টি হয়। আর এটাই হল সাংস্কৃতিক ব্যবধান। অর্থাৎ কোন সংস্কৃতির মধ্যে অসমগতিতে চলমান দুটি অংশের মধ্যে বিদ্যমান চাপ (Stain) হল সাংস্কৃতিক ব্যবধান।

এতত্ত্বের মূল কথা হলো–

- সংস্কৃতির বিভিন্ন অংশ পরস্পরের সঙ্গে কার্যকারণ সূত্রে আবদ্ধ।
- সংস্কৃতির বিভিন্ন অংশ অসম গতিতে এগিয়ে চলে।
- সাধারণ বস্তুগত সংস্কৃতি অবস্তুগত সংস্কৃতির তুলনায় বেশি গতি ও মাত্রায় এগিয়ে চলে।
- সংস্কৃতির অংশগুলো অসমভাবে এগিয়ে চলার কারণে ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায় শিল্পকারখানা ও শিক্ষা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। তাই শিল্প কারখানায় কোন পরিবর্তন দেখা দিলে শিল্পখারখানা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা জরুরি হয়ে পড়ে। কেননা যান্ত্রিক শিল্পের জটিল কার্যক্ষমতা সম্পর্কে অধিক জ্ঞানের জন্য চাই শিক্ষা, নতুবা যন্ত্র পরিচালনা সম্ভব হবে না।

একটি সুস্থ্য সাবলীল গতিশীল সমাজের বৈশিষ্ট্য হল সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন অংশ ও উপাদানের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা। কিন্তু সাংস্কৃতিক ব্যবধানের কারণে নগরায়ন যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে নগর

মানসিকতা সে হারে পিছিয়ে আছে। বস্তু জগতের সাথে তাল মিলিয়ে মনোজগতের উন্নতি সম্ভব হচ্ছে না। আধুনিক সভ্যতা তাই আমাদের অনেক কিছু উপহার দিচ্ছে বটে তবে কেড়ে নিচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৫

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. "সমাজের উপাদান প্রণালীর পরিবর্তনই সামাজিক পরিবর্তন।" সংজ্ঞাটি কার?
   ক. কার্ল মার্কস
   খ. রোনাল্ড রোবার্টসন
   গ. মরিস জেন্সবার্গ
   ঘ. অগাস্ট কোৎ

২. সংস্কৃতায়ন কি?
   ক. পোষাক পরিচ্ছদের পরিবর্তন
   খ. খাবার দাবারের পরিবর্তন
   গ. আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন
   ঘ. জীবনযাত্রার পরিবর্ধন

৩. Cultural lag (সাংস্কৃতিক ব্যবধান) তত্ত্বটি প্রদান করেছেন–
   ক. W.F. Orburn
   খ. Emile Durkhin
   গ. Herbert Spancer
   ঘ. Max Weber

উত্তরমালা: ১. ক, ২. খ, ৩. ক

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. সামাজিক পরিবর্তন বলতে কী বোঝায়?
২. বিশ্বায়ন কাকে বলে?
৩. সাংস্কৃতিক ব্যবধান বলতে কী বোঝায়?
৪. সামাজিক পরিবর্তনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. সামাজিক পরিবর্তনের সংজ্ঞা দিন। সামাজিক পরিবর্তনের কারণগুলো ব্যাখ্যা করুন।
২. সামাজিক পরিবর্তন কিভাবে অভিযোজন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ ৭.৬: মূল্যবোধ ও নৈতিককতার উন্নয়ন
Development of Values and Morality

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মূল্যবোধ কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মূল্যবোধ বিভিন্ন প্রকার উল্লেখ করতে পারবেন।
- নৈতিকতা বলতে কী বুঝায় তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- নৈতিক উন্নয়নের গতি প্রকৃতি ও শর্ত সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করতে পারবেন।

মূল্যবোধের স্বরূপ (Nature of Values)

মূল্যবোধ নিয়ে জ্ঞানের যে শাখাটি আলোচনা করে তাকে মূল্যবোধ বলা হয়। এটি দর্শনের অন্যতম একটি শাখ। তাই দর্শনের যে শাখাটি বিশেষভাবে মূল্যের স্বরূপ, শ্রেণীকরণ তাৎপর্য ও বাস্তবাস্থার সাথে এর সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে তাকে বলা হয় মূল্যবিদ্যা। আর দর্শনের অন্যতম প্রধান কাজ মূল্যের স্বরূপ ও তাৎপর্য নির্ণয় করা, যা বিজ্ঞানীরা কখনোই করেন না। আর এখানেই বিজ্ঞানের সাথে দর্শনের পার্থক্য। এখন আমরা মূল্যের স্বরূপ ও তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা করব। তবে এ বিষয়ে অন্যান্য বিষেয়র মতই মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। আক্ষরিক অর্থে মূল্য বলতে আমরা সাধারণত যোগ্যতা বা উৎকর্ষতাকে বুঝিয়ে থাকি। সেদিক থেকে যে বস্তুর উপযোগিতা আছে দৈনন্দিন জীবনে আমরা তাকেই মূল্যবোধ বলে মনে করি। এ জন্য আমরা প্রথমেই মূল্য শব্দটির অর্থ বিশ্লেষণ করব। বুৎপত্তিগত দিক থেকে মূল্যের ইংরেজী প্রতিশব্দ Value, শব্দটি এসেছে ল্যাটিন Valco থেকে। বাংলা ভাষায় শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় "ফলপ্রসূ ও উপযুক্ত হওয়া" (Effective and adequate)। আবার ফারসী প্রতিশব্দ Valeur, বাংলা ভাষায় যার অর্থ উৎকর্ষ (Excellence)। আবার ইটালী প্রতিশব্দ Valuta-এর বাংলা অর্থ হলো দাম। আর জার্মান প্রতিশব্দ Wert-এর বাংলা অর্থ মূল্য। যা হোক শব্দটির বিভিন্ন ব্যবহারের কারণেই দার্শনিকদের মধ্যে মূল্য কথাটির তাৎপর্য নিয়ে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়।

নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার বিশ্লেষণ করলে মূল্য শব্দটির প্রকৃত অর্থ দাঁড়ায় বস্ত বা ব্যক্তির মূল্য নির্ধারণ বা মূল্য বিচার। সাধারণত আমরা ব্যক্তি বা বস্তুকে দু'ভাবে দেখি একটি হলো, ব্যক্তি বা বস্তু প্রকৃত অবস্থা কেমন অন্যটি হলো ব্যক্তি বা বস্তুটি কী ধরনের গুণের অধিকারী। দার্শনিকগণ এই শেষোক্ত দৃষ্টিতেই মূল্য শব্দটি গ্রহণ করেছেন। আর এভাবে ব্যক্তি বা বস্তুর গুণ বিচার করতে গিয়েই আমরা কোন কিছুকে শুভ-অশুভ, সত্য-মিথ্যা, সুন্দর-অসুন্দর, ভালো-মন্দ ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করি। এ প্রক্রিয়াকেই বলা হয় মূল্যায়ন বা মূল্য নির্ণয়।

মূল্যের স্বরূপ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ

ভাববাদী দার্শনিকগণ মূল্যকে বস্তুগত বলে মনে করেন। তাঁদের মতে সত্যতার ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক বচনগুলোকে যেমন আমরা বস্তুগত বলে মনে করি, মূল্য ধারণের ক্ষেত্রে ও মূল্য বা আর্দশের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

দার্শনিক আলেকজান্ডের বাস্তববাদী দৃষ্টিতে মূল্যকে ব্যাখ্যা করন। তার মতে, মূল্যের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই।

প্রয়োগবাদী দার্শনিকগণ বাস্তব উপযোগিতাকেই মূল্য বলে মনে করেন। কেননা যে বস্তুর ব্যবহারিক মূল্য আছে তাকেই আমরা মূল্যবোধ বলি। অন্যদিকে যৌক্তিক দৃষ্টবাদীগণ মনে করেন, মূল্য বক্তার আবেগকে প্রকাশ করে।

মোট কথা সকল দার্শনিক মতবাদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মূল্যকে দু'দিক থেকে বিবেচনা করা যেতে পারে। (এক) আত্মগত মত এবং (দুই) বস্তুগত মত। মূল্যকে যারা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত বা বিষয়ীগত বলে মনে করেন সেটাকেই বলা হয় আত্মগত মত (Subjective view of value)। অন্যদিকে যারা মূল্যকে সম্পূর্ণরূপে বস্তুগত বা বিষয় গত অর্থাৎ বস্তু সাপেক্ষ বলে মনে করে তাকে বলে মূল্যের বস্তুগত মত (Objective view of value) নিরপেক্ষ বিচারে বলতে হয় যে, মূল্য আসবে বস্তুগত ও বিষয়ীগত উভয়ই। যেমন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতগুলো ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতির হলেও তার নিজস্ব একটা মূল্যও আছে যা আমাদের সবাইকেই পরিতৃপ্ত করে। কাজেই মূল্য আত্মগত ও বস্তুগত দুই-ই।

মূল্যের শ্রেণিবিন্যাস

মূল্যকে বিভিন্ন নীতির আলোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এর বিভিন্ন শ্রেণিও রয়েছে। প্রধান প্রধান শ্রেণিগুলো নিচে তুলে ধরা হলো।

১. নৈতিক ও অনৈতিক মূল্য;
২. দৈহিক ও মানসিক মূল্য;
৩. উচ্চতম ও নিম্নতম মূল্য;
৪. স্বত:মূল্য ও পরত:মূল্য;
৫. আপেক্ষিক ও চরম মূল্য।

নিচে সংক্ষেপে মূল্যের বিভিন্ন প্রকার সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো–

১. **নৈতিক ও অনৈতিক মূল্য:** দৈনন্দিন জীবনে আমরা মূল্য শব্দটিকে ভাল মন্দ, নৈতিক অনৈতিকসহ আরো অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহার করি। নৈতিক মূল্যকে অন্যান্য মূল্যের সাথে গুলিয়ে ফেলা যাবে না। নৈতিকমূল্যকে বুঝতে হলে অনৈতিকমূল্যকে বুঝতে হবে। অর্থনীতিকে যে মূল্যের বলা হয় হয় তা অর্থনৈতিক মূল্য। টাকা-পয়সার বিনিময়ে আমরা পণ্য ক্রয় বিক্রিয় করি এটাকে বলা হয় বিনিময় মূল্য। সুন্দর ছবি, গান, নৃত্য, কবিতা-নাটক প্রভৃতির রয়েছে নান্দনিক মূল্য। আবার মন্দির, গীর্জা, মসজিদ এ সবের রয়েছে ধর্মীয় মূল্য। উল্লেখ্য এসব মূল্যের নৈতিক কোন মূল্য নেই, এদের রয়েছে নীতি নিরপেক্ষ মূল্য। আর এসব মূল্যকেই বলা হয় অনৈতিক মূল্য। এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে নৈতিক মূল্য বলতে তা হলে কী বুঝায়? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, যে সকল কাজ মানুষ স্বত:স্ফুর্তভাবে স্বেচ্ছায় সচেতনভাবে করে থাকে, যে কাজে তার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে যে সে কোন কাজটি করবে এবং যে কাজের ওপরে আমরা ভাল-মন্দ বা উচিত অনুচিত শব্দগুলো প্রয়োগ করতে পারি তাকেই বলে নৈতিক কর্ম। আর নৈতিক কর্মের কেবল নৈতিক মূল্য রয়েছে। নৈতিক কাজ কখনোই আকস্মিকভাবে বা কোন কিছু দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানুষ করে না। বরং কেন না কোন নীতিই কাজের চালিকা শক্তিরূপে কাজ করে। আর সেদিক থেকে কেবলমাত্র স্বেচ্ছা প্রনোদিত কর্মই নৈতিক মূল্যের অধিকারী।
২. **দৈহিক ও মানসিক মূল্য:** মানুষ দেহ ও মন নামক দুটির মিলিত প্রকাশ। দৈহিক মূল্য বলতে দেহের মূল্যকে বুঝায়। যেমন– ক্ষুধা, তৃষ্ণা, স্বাস্থ্য, সম্পদ, কর্মদক্ষতা ও যৌন কামনা-বাসনা ইত্যাদি অভাবের সাথে মানুষের দৈহিক মূল্য জড়িত। পক্ষান্তরে চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা নামক মানব মনের তিনটি বৃত্তির সাথে জড়িত থাকে মানুষের মানসিক মূল্য। এই তিনটি বৃত্তি থেকেই আসে সত্য, সন্দুর ও মঙ্গলের আদর্শ। চিন্তা থেকে আসে সত্য, অনুভূতি থেকে আসে সুন্দর এবং ইচ্ছা থেকে আসে মঙ্গ।
৩. **উচ্চতম ও নিম্নতম মূল্য:** উৎকর্ষের তারতম্যের ভিত্তিতে মূল্যকে দুটিভাগে ভাগ করা হয়। তাহলো উচ্চতম ও নিম্নতম মূল্য। মানসিক যে মূল্যগুলোর কথা বলা হয় তার ভিত্তিতে আবার অধ্যাত্মিকতার প্রভাবেও কিছু মূল্য

গড়ে ওঠে। এগুলোকে বলা হয় উচ্চতম মূল্য। কেননা মানব জীবনে এগুলো যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে দৈহিক মূল্যকে বলা হয় নিম্নতম মূল্য। এগুলো ভূমিকা জীবনে গৌণ।

৪. **স্বত:মূল্য ও পরত:মূল্য:** ব্যক্তি বা বস্তুর নিজস্ব কোন মূল্য আছে কীনা এ প্রশ্নকে কেন্দ্র করে মূল্যকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। (এক) স্বত:মূল্য ও (দুই) পরত:মূল্য। যে বস্তু নিজস্ব মূল্য রয়েছে সেই বস্তুর মূল্যকে বলা হয় স্বত:মূল্য। যেমন– সত্য, সুন্দর, মঙ্গল এ আদর্শগুলোর নিজস্ব মূল্য রয়েছে। কিন্তু যে বস্তুর নিজস্ব মূল্য নেই, বরং অপর বস্তুকে মূল্যবান করতে সহায়তা করে সেই বস্তুর মূল্যকে বলা হয় পরত:মূল্য। যেমন– টাকা-পয়সা। এগুলোর নিজস্ব কোন মূল্য নেই তবে বিনিময় মূল্যের কাজে সহায়ক ভূমিকা রাখে বলে এদের মূল্যকে পরত:মূল্য বলে।

৫. **আপেক্ষিক ও চরম মূল্য:** উপযোগিতার দিক থেকে মূল্যকে আপেক্ষিক মূল্য ও চরম মূল্য এ দু'ভাগে ভাগ করা হয়। সত্য, সন্দুর, মঙ্গল এগুলো জীবনের আদর্শ হিসেবে কাজ করে তাই এদেরকে পরম মূল্য বা চরম মূল্য বলা হয়। তাছাড়া এদের নিজস্ব মূল্যও রয়েছে। তাই এদেরকে স্বত:মূল্য ও বলা হয়। কিন্তু যে সব মূল্যকে মানুষ জীবনের আদর্শ বা লক্ষ্য রূপে গ্রহণ করে না তাদের বলা হয় আপেক্ষিক মূল। দৈহিক ও অর্থনৈতিক মূল্যগুলো আপেক্ষিক মূল্যের আওতাভুক্ত। কেননা আমার কাছে যা মূল্যবান তা আরেক জনের কাছে মূল্যবান নাও হতে পারে। তাই এ ধরনের মূল্যকে আত্মগত মূল্য ও বলা যায়।

নৈতিকতার স্বরূপ ও নৈতিক উন্নয়নের প্রকৃতি

মূল্য বলতে কী বুঝায় তা আমরা পূর্বের পাঠ থেকে উপলব্ধি করতে পেরেছি এবং কত প্রকার ও কী কী সে বিষয়ের আলোচনা করেছি। এখন আমরা এই পাঠ থেকে নৈতিকতা বলতে কী বুঝায় এবং নৈতিক উন্নয়ন কী সে বিষয়ে আলোচনায় অগ্রসর হব।

প্রত্যেক মানুষেরই একটা নৈতিক জীবন আছে। আর নৈতিক জীবনে বিশ্বাস আছে বলেই মানুষ নিজের ও অপরের আচরণ সম্বন্ধে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, নীতি-দূর্নীতি, পাপ-পূন্য ইত্যাদি শব্দগুলো ব্যবহার করি। কিন্তু নৈতিকতা বলতে আসলে কী বুঝায়? ইংরেজি "Moral" শব্দটি ল্যাটিন শব্দ "Mores" থেকে এসেছে যার অঙ্গ "রীতি-নীতি" বা "অভ্যেস"। নীতি বিজ্ঞান হচ্ছে সমাজে বসবাসকারী মানুষের রীতিনীতি বা অভ্যেস জাতি আচরণ নিয়েই আলোচনা করে। ইংরেজি "Morality" যার বাংলা প্রতিশব্দ নৈতিকতা। আর যে মানসিক ক্রিয়ার দ্বারা আমরা মানুষের আচরণের ভাল মন্দ বা ন্যায়-অন্যায় বিচার করি তাকে বলে নৈতিকতার (Moral Judgement)। নৈতিক বিচার আবার নৈতিক বাধ্যতাবোধ (Moral Obligution)-এর সাথে সম্পৃক্ত। যখন কোন কাজ ভাল না মন্দ ভেবে নিয়ে ভাল কাজটি করা হয় তখন যে তাগিদ আমরা বোধ করি একেই বলে নৈতিক বাধতাবোধ। একেই বলা হয় কর্তব্যবোধ বা ঐতিয্যবোধ। এ ধরনের প্রত্যেকটি কাজের নৈতিক মূল্য রয়েছে যা মানুষ স্বেচ্ছায় করে। তাই নৈতিক কাজ হচ্ছে ঐচ্ছিক কাজ বা ক্রিয়া আর নীতি বিজ্ঞান এ ঐচ্ছিক ক্রিয়ার মূল্য বিচার করে জৈবিক আদর্শের আলোকে। নৈতিক মূল্য বা আদর্শকে সামনে রেখেই মানুষের কর্ম ও জীবন পরিচালিত হয়। আর নৈতিক বিচারের কর্তা হচ্ছে মানুষের মন বা স্বীয় বিবেক। ম্যাকেঞ্জি তাই বলেন নৈতিক বিচারের কর্তা বলতে আমরা বুঝব, যে দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করা হয় সেইটি। একটা আদর্শ মান অনুসারে আমরা নৈতিক বিচার করি। বিবেক হচ্ছে নৈতিক বৃত্তি (Moral Fuculty) যা এক প্রকার মানসিক শক্তি বা ক্ষমতাকে বুঝায়। এর মাধ্যমেই কাজের নৈতিক মূল্য বা গুণ নির্ধারণ করতে আমরা সক্ষম হই। নৈতিক বৃত্তিকে ইংরেজিতে বলা হয় Conscience, যার বাংলা হলো 'বিবেক'। এই বিবেকই আমাদেরকে সৎ বা ভাল কাজ করতে প্রেরণ দেয়। যখন কোন ভাল কাজ করা হয় তখন তা আমাদের চরিত্রের নৈতিক মূল্যকে বাড়িয়ে দেয়। আর এটা যখন প্রতিদিন বা প্রতিনিয়ত হতে থাকে তখন আমরা নৈতিক আদর্শের দিকে একটু একটু করে ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে থাকি। যেমন নিয়মিত সত্য কথা বললে সত্যতা দীতা গুণটি অর্জন করা যায়, যাকে বলা হয় সততা। আর

এভাবে নৈতিক আদর্শ নৈতিক উন্নয়ণ বা অগ্রসগতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। নৈতিক উন্নয়ন বা অগ্রগতির অর্থই হলো নৈতিক আদর্শের দিকে সমর্পিত হওয়া ও পরম কল্যাণের দিকে অগ্রসর হওয়া।

নৈতিক উন্নয়নের শর্তসমূহ

অধ্যাপক জেমস সেথ-এর মতে নৈতিক উন্নয়নের মূল কথাই হচ্ছে ব্যক্তির নিজেকে আবিস্কার করা। নৈতিক অগ্রগতির প্রশ্নে মনে রাখতে হবে যে, মানুষ জন্মগতভাবে নৈতিকতাকে পায়। আর নীতিবোধ সুপ্তবস্থায় তার মাঝে থাকে সেইটি ধীরে ধীরে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। কখনোই অনৈতিক স্তর থেকে নৈতিক স্তরে আমাকে নৈতিক উন্নয়ন বলে না এবং এ অগ্রগমন নীতিবোধেরই অগ্রগমন।

নৈতিক অগ্রগতিকে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে এর কতকগুলো পর্যায় বা শর্তকে ম্যাকেঞ্জী উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলো নৈতিক জগত, বাহ্যিক জগতের সাথে অভ্যন্তরীণ বিরোধীতা, অপূর্ণতারবোধ, নৈতিক অন্তদৃষ্টির গভীর তা নতুন বাধ্যবাধকতা, নৈতিক পরিবর্তন ও পরিবেশের পরিবর্তন এবং আদর্শ জগত। নিচে শর্তগুরো আলোচনা করা হলো–

১. **নৈতিক জগত (Moral Universe):** নৈতিক উন্নয়নে একটি প্রথম ও প্রধান শর্ত বা পর্যায়। কেননা প্রত্যেক মানুষ একটি নৈতিক জগতেই বাস করে। নৈতিক আদর্শ, নির্দিষ্ট সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও ক্রিয়ার অভ্যেসগতরূপ ও তিনটি উপাদান নিয়েই নৈতিক জগত গঠিত। এ তিনটি উপাদানের মধ্যে সঙ্গতি স্থাপিত হলেই নৈতিক উন্নয়নের পথ সুগত হয় অন্যথায় বাধাগ্রস্থ হয়।
২. **আমাদের জগতের অভ্যন্তরীণ বিরোধতা:** নৈতিক আদর্শ, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও অভ্যাসের মধ্যে বিরোধিতা দেখা দিলে তাদের মধ্যে সঙ্গতি প্রতিষ্ঠা জরুরি হয়ে পড়ে। আর অভ্যন্তরীণ বিরোধিতার মাঝে সমূতি ও সমন্বয় সাধিত হলে নৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম হয়।
৩. **অপূর্ণতাবোধ:** নৈতিক উন্নয়নের নৈতিক অপূর্ণতাবোধ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কেননা ও অসম্পূর্ণতাবোধ থেকে এক ধরনের সচেতনা কাজ করে নৈতিক সংস্কার ও শিক্ষার জন্য ফলশ্রুতিতে নৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত হয়।
৪. **নৈতিক অর্ন্তদৃষ্টির গভীরতা:** প্রাচীনকালের তুলনায় বর্তমানকালে সদগুণ বা নৈতিক আদর্শ বাস্তবায়নের পরিসীমা বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু তাই নয় সদগুণগুলো যে সব সূত্রের উপর নির্ভর করে সেটার গভীর তারও বিস্তৃতি ঘটেছে।

জেমস সেথ নৈতিক উন্নয়নের গতি পথে তিনটি পর্যায়ের কথা বলেছেন। যেমন, বাহ্যিক হতে অভ্যন্তরীণ নৈতিকতায় গমন, কঠোর গুণগুলোকে কোমল গুণগুলোর অধীনস্থ করা, সত্যতা সম্পর্কে ব্যাপক অর্ন্তদৃষ্টি ব্যক্তির নৈতিক অগ্রগতি ও উন্নয়নের জন্য যে বিষয়গুলো অপরিহার্য শর্তরূপে বিদ্যমান থাকে সেগুলো হলো–

১. বুদ্ধির অনুশীলন;
২. আত্মসংযম;
৩. বিনয় ও নম্রতা;
৪. সদগুণের অনুশীলন;
৫. মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী পাঠ;
৬. সৎ সংসর্গ;
৭. অনুশোচনাবোধ;
৮. সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবেশ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৬

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. অর্থনৈতিক মূল্যের অপর নাম কী?
   ক. বিনিময় মূল্য
   খ. সতমূল্য
   গ. আপেক্ষিক মূল্য

২. যে কর্মকে উচিত অনুচিত বা ভাল ও মন্দ বলে মূল্যায়ন করা হয় তাকে কী বলা হয়?
   ক. মানুষিক মূল্য
   খ. অনৈতিক কর্ম
   গ. নৈতিক কর্ম

৩. ইংরেজি Mores শব্দটি কোন শব্দ থেকে উৎপত্তি?
   ক. ল্যাটিক শব্দ Mores
   খ. ইংরেজি Morality
   গ. কোনটিই নয়

৪. অধ্যাপক জেমস সেথ-এর মতে, নৈতিক উন্নয়নের মূল কথা কোনটি?
   ক. নিজেকে বিকশিত করা
   খ. নিজেকে আবিস্কার করা
   গ. অনৈতিক স্তর হতে নৈতিক স্বরে গমন করা

৫. সৎ বা ভালো কাজকে আমাদের প্রেরণা দেয়?
   ক. বিবেক
   খ. বুদ্ধি
   গ. অভ্যাস

উত্তরমালা: ১. ক, ২. গ, ৩. ক, ৪. খ, ৫. ক

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. মূল্য বলতে কী বুঝায়? মূল্যের বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা করুন।

২. মূল্য কত প্রকার ও কী কী? বিভিন্ন প্রকার মূল্যের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

৩. নৈতিকতা বলতে কী বুঝায়? নৈতিকতাবোধ ও নৈতিক বিচার কীভাবে সম্পৃক্ত? নৈতিক বিচারের কর্তা কে?

৪. নৈতিক উন্নয়নের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করুন। নৈতিক উন্নয়নের শর্তসমূহ তুলে ধরুন।

তথ্য নির্দেশনাঃ

১. গোবিন্দ চন্দ্র দেব, তত্ত্ববিদ্যা সার, ১৯৬৬, পৃ. ২৪৯।
২. J. Laird, the Idea of Value, পৃ. ৯২-২৩।
৩. S. Alexander, Space, Time and Deity, পৃ. ২৪৪।
৪. A. J. Ayer, Language, Truth and Lagic, London, 1967, পৃ. ১৪৯-৫০।

পাঠ ৭.৭: মুক্তচিন্তার বিকাশ ও অনুশীলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মুক্তচিন্তার ও বুদ্ধিমুক্তি আন্দোলনের পটভূমি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মুক্তচিন্তার প্রবর্তক কারা ছিলেন তা বলতে পারবেন।
- মুক্তচিন্তার লক্ষ্য উদ্দেশ্য নির্ণয় করতে পারবেন।
- তৎকালীন সমাজের উদ্ভূত সমস্যাগুলো চিহ্নিত ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুক্তচিন্তার পটভূমি ও লক্ষ্য

মানুষ তার চিন্তা শক্তির জন্যই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। চিন্তা বা বুদ্ধিই তাকে দিয়েছে স্বতন্ত্র মর্যাদা। সভ্যতার অগ্রযাত্রায় বুদ্ধির দীপ্তি, প্রতিভা ও বুদ্ধি-মানুষের প্রধান হাতিয়ার। মুক্তচিন্তা তার নব নব সৃষ্টির মূলীভূত শক্তি। ব্যক্তিগত জীবনে হোক, জাতীয় জীবনে হোক, মুক্তবুদ্ধিই মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়। কিন্তু মানুষের শৃঙ্খলিত আবদ্ধ চিন্তা ভাবনা তথা বুদ্ধি তার চলার পথে বাধা হয়ে যায় ফলে অগ্রযাত্রা রুদ্ধ করে দেয়। স্বাধীনতা হারিয়ে রাজনৈতিক প্রবঞ্চনা ও অর্থনৈতিক অধঃপতনের শিকারে পরিণত হয়। এ দেশের মুসলমান সমাজ অতীতমুখী ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তাই নয়, জীবন সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে তারা মুক্তচিন্তার পরিবর্তে ক্রমশঃ ধর্মীয় কুসংস্কারে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। বাঙালী মুসলমান সমাজের এই চরম সংকটকালে মুক্তবুদ্ধির একদল চিন্তাবিদ সামনে এগিয়ে আসেন জীবনের বিভিন্নমূখী সমস্যা সমাধানে কিভাবে বুদ্ধির যথার্থ প্রয়োগ করা যায় সেদিকে আহ্বান জানান। মুক্তবুদ্ধি এবং মুক্তমনের মাহাত্ম্য ঘোষণা করা, জ্ঞানের দিগন্ত প্রসারিত করা এবং অতীতমূখী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মুসলমানদেরকে মুক্ত করে বর্তমানকালের বাস্তবকে যুক্তিনিষ্ঠভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল বুদ্ধিমুক্তি আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। জীবনকে যৌক্তিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করে কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে আলোকিত জীবনে প্রবেশ করা যায় কীভাবে সে উদ্দেশ্যেই তারা কাজ করেন। এই আন্দোলন বাঙালীর দর্শনে একটি বুদ্ধিবাদী ও মানবতাবাদী আন্দোলন। একে মুসলিম দর্শনের মুতাজিলা আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

মুক্তচিন্তার প্রবর্তক

তাঁরা হলেন মুক্তচিন্তার প্রধান প্রবক্তা ও অনুসারী হিসেবে যাদের নাম উল্লেখ না করলেই নয়, সৈয়দ আবুল হোসেন, কাজী আব্দুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ। মুক্তবুদ্ধির চিন্তাবিদগণ এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন ও জড়ালো ভূমিকা রাখেন ১৯২৫ সালের ১৯ শে জানুয়ারি তারিখে ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পাদক আবুল হোসেন তাঁর বিবরণীতে বলেছেন, "এই সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞানের জন্য আকাঙ্ক্ষা ও রুচি-সৃষ্টি এবং তদুদ্দেশ্যে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে নবীনও প্রবীণ সকলের চিন্তা ও জ্ঞানের সমন্বয় ও সংযোগ সাধন।" সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কাজী আব্দুল ওদুদের ভাষায়, "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমণ্ডলে মুসলিম সাহিত্য সমাজ নামে একটি সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়, তার মূলমন্ত্র ছিল বুদ্ধির মুক্তি। ...বুদ্ধির মুক্তি, অর্থাৎ বিচার-বুদ্ধিকে অন্ধ সংস্কার ও শাস্ত্রানুগত্য থেকে মুক্তিদান– বাংলার মুসলমান সমাজে এ ছিল এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। কিন্তু সেদিন বিস্ময়কর হয়েছিল বাংলার শিক্ষিত মুসলিম তরুণের উপর এক প্রভাব একটি জিজ্ঞাসু ও সহৃদয়-গোষ্ঠীর সৃষ্টি সম্ভবপর হয়েছিল এর দ্বারা। দৃশ্যতঃ এর প্রেরণা এসেছিল মুস্তফা কামালের উদ্যম থেকে, কিন্তু তারও চাইতে গুঢ়তর যোগ এর ছিল বাংলার বা

ভারতের একালের জাগরণের সঙ্গে আর সেই সূত্রে মানুষের প্রায় সর্বকালের উদার জাগরণ–প্রয়াসের সঙ্গে।" এই সাহিত্য-সমাজের নামের সঙ্গে মুসলিম শব্দটি যুক্ত থাকলেও তা কোন সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান ছিল না। সম্পাদক আবুল হোসেন তাঁর বার্ষিক বিবরণীতে যাবতীয় বিভ্রান্তির অবসান ঘটিয়ে ঘোষণা করেন: "এ সমাজ কোন একটি বিশিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয় কিংবা এ কোন এক বিশেষ সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য গঠিত হয়নি। সাহিত্য সৃষ্টি করাই এর উদ্দেশ্য, আর সেই সাহিত্যে মুসলমানের প্রাণ ও জীবন ফুটিয়ে তোলাই ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য।"

মুক্তচিন্তার বিকাশ ও অনুশীলনের ক্ষেত্রসমূহ

মুক্তচিন্তার অনুসারীগণ গভীরভাবে তৎকালীণ সমাজ ও রাজনীতির অবস্থা বিশ্লেষণ পূর্বক তাদের করণীয় নির্ধারণ করেন। যা বুদ্ধিমুক্তির আন্দোলন হিসেবে গণ্য হয়।

এই বুদ্ধিমুক্তির আন্দোলন সময়োচিত ছিল। পলাশীর প্রান্তরে বাংলার তথা এই উপমহাদেশের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়ে ঘন অন্ধকারে ছেয়ে গিয়েছিল সত্য, কিন্তু এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন শুরু হওয়া থেকে ঘণ আবরণ ধীরে ধীরে অনসৃত হতে থাকে। এ দেশের হিন্দু সমাজ পাশ্চাত্য শিক্ষার আর্শীবাদকে বরণ করে নেয়। আর মুসলমান সমাজ এ শিক্ষা থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে গিয়ে ধীরে ধীরে কুসংস্কারের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। বুদ্ধিমুক্তির আন্দোলন তাই বাঙালী মুসলমানদের অতীতমুখী চিন্তাধারার উপর প্রথম আঘাত। পিছিয়ে পড়া সমাজ দেরীতে হলেও এই আন্দোলনের মর্মার্থ অনুধাবন করতে পেরেছিল। ঊনবিংশ শতকে বাংলায় যে নব জাগরণ দেখা দিয়েছিল এ তারই পরিপূরক এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

মুসলিম সাহিত্য সমাজ ও তার মুখপাত্র কর্তৃক যে বুদ্ধিমুক্তির আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার লক্ষ্য ছিল মুক্ত চেতনা–মুক্ত চিন্তার জন্ম দেওয়া, কিন্তু এই আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, আজ সমাজ যে সমস্যায় জর্জরিত তার সমাধান করতে না পারলে মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তার স্রোতহ সমাজে প্রবাহিত হতে পারবে না। তাই তাঁরা তখনকার সমাজে উদ্ভুত সমস্যাগুলির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন। এই সমস্যাগুলিকে কেন্দ্র করেই মুক্তচিন্তার চর্চা ও অনুশীলন ঘটতে থাকে। নিচে সেগুলো পর্যায়ক্রমে ব্যাখ্যা করা হলো–

১. মাতৃভাষা সংক্রান্ত বিভ্রান্তি দূরীকরণ;
২. শিক্ষা ব্যবস্থায় বহুমুখীতার যোগ;
৩. অর্থনৈতিক অব্যবস্থার অবসান;
৪. রাজনৈতিক জটিলতা নিরসন;
৫. ললিতকলার চর্চা; এবং
৬. ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির সূচনা।

১. **মাতৃভাষা সম্পর্কিত বিভ্রান্ত দূরীকরণ:** ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে এবং বিংশ শতকের প্রথম দিকে মাতৃভাষা নিয়ে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে মতানৈক্য ছিল। কেউ কেউ এ ধরনের মতবাদ পোষণ করতেন যে আরবী, ফাসী বা উর্দু ভাষার চর্চা ছাড়া এ জাতির মানসিক বিকাশ সম্ভব নয়। বাংলা ভাষার চর্চার ফলে ভ্রান্তিদূল হয়। মুসলিম সাহিত্য সমাজ কর্তৃক আয়োজিত মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্পর্কীয় বিভিন্ন বিতর্কের ফলাফল থেকে তা জানা যায়। অধ্যাপক এ. এফ. রহমান, খান বাহাদুর তসদ্দুক আহমদ, আব্দুর রহমান খাঁ, অধ্যাপক মাহমুদ হাসান, খান বাহাদুর নাসির উদ্দীন প্রমুখের ভাষণ থেকে মাতৃভাষার গুরুত্ব পরিস্ফুট হয় এবং জনমন থেকে মাতৃভাষা সম্পর্কিত বিভ্রান্তি অপসারিত হতে থাকে। বুদ্ধি সম্পন্ন অধ্যাপক মাহমুদ হাসান অবাঙালী হওয়া সত্ত্বেও যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে বাংলাদেশে উর্দুকে মাতৃভাষা করতে চাওয়ার মত আহম্মকি আর নেই। বাংলার মুসলমান এতদিন অনর্থক উর্দূর পিছু পিছু ছুটে মারাত্মক ভুল করেছে। তাই আজ তারা অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের চেয়ে অনুন্নত।

২. **শিক্ষা ব্যবস্থায় বহুমুখীতার যোগঃ** সাহিত্য জাতির মানস-প্রতিফলন; এর মধ্যে তার মননের বিচিত্র রূপ বিধৃত। এই মননের উৎকর্ষ সাধণ করতে হলে শিক্ষা অপরিহার্য। শিক্ষা ছিল একমুখী ও আলোচ্য যুগে মুসলমানেরা বুঝত দীন-ই-ইলম বা ধর্মীয় বিদ্যা শিক্ষা করা দরকার। কিন্তু সমাজের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য যে সর্বমুখী শিক্ষার প্রয়োজন সে কথা বাঙালী মুসলমানেরা বুঝতেই চাইত না। এই মানসিকতা সম্পন্ন লোক এখনও দু'চারটা চোখে পড়ে না এমন নয়। এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান চিন্তাবিদ অধ্যাপক আবুল হোসেন ও সমাজের, এ জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এদেশে আগত সূফী সাধকগণের ..... বানী "তাখাল্লাকু বে-আখলাকিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর গুণে বিভূষিত হও। আল্লাহ যেমন অনন্ত গুণের অধিকারী, মানুষকে তেমনি অনন্ত গুণের অধিকারী হতে হবে। সমাজের প্রয়োজনে আমাদের ভেতর থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমৃদ্ধির জন্য বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি করতে হবে। সমাজের ভেতর থেকেই শক্তির উদ্বোধন করে সমাজের অগ্রগতি সাধন করতে হবে, একথা মুসলিম সাহিত্য সমাজের চিন্তাবিদগণ উপলব্ধি করেছিলেন যে প্রচলিত শিক্ষা একমুখী, তাকে বহুমুখী করা দরকার। শুধু তাই নয়, বৃহৎ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ তৈরি করার জন্যও তারা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর প্রয়াস পেয়েছিলেন। মোতাহার হোসেন চৌধুরী বলেন, "শিক্ষার দু'টি আদর্শ আছে, একটি প্রয়োজনের অপরটি অপ্রয়োজনের। আমার মনে হয় প্রথম আদর্শটি সামনে রেখেই আমরা শিক্ষা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলাম। তাই মহৎ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন চিন্তাশীল মানুষ আজ আমাদের সমাজে দেখতেই পাওয়া যায় না।" এ সময় মুক্তচিন্তার আলোকে শিক্ষায় বহুমুখী পত দিকনিদের্শনার কাজ করে যোগ হয় নতুন মাত্রা।

৩. **অর্থনৈতিক অব্যবস্থা দূরীকরণঃ** বৃটিশ শাসনের ফলে মুসলমানেরা রাজ্য হারিয়েছিলেন, ইংরেজি রাষ্ট্র ভাষা হওয়ায় চাকুরী হারিয়েছিলেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে তারা জমির মালিকানাও হারিয়েছিলেন। এভাবে তারা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সর্বশান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এ অবস্থার সঙ্গে ইংরেজি-শিক্ষা-বর্জন-মানসিকতা তাদেরকে একশ' বছর পিছনের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। মুসলিম সাহিত্য সমাজের চিন্তাবিদগণ তৎকালীন মুসলমান সমাজের অর্থনৈতিক সংকট সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। এ সম্পর্কে অন্যতম বুদ্ধিবাদী চিন্তাবিদ মোতাহার হোসেন চৌধুরী বলেন, "আর্থিক দুর্গতি দূর করতে হলে আজ আমাদেরকে সত্যিকার সুজনমূলক আন্দোলনে হাত দিতে হবে, গ্রামে গ্রামে শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাদের জীবনের অলসতাকে দূর করে তাদেরকে কর্মী করে তুলতে হবে। এক কথায়, তাদের অন্তরে জীবনের স্বাদ পৌঁছিয়ে দিয়ে তাদেরকে জগৎ ও জীবনের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করে তুলতে হবে। ... আজ আমাদের মনে রাখতে হবে, মুসলমানের উন্নতি ইংরাজের নিকট পেশ, অথবা হিন্দুর প্রতি ঈর্ষা পোষণের মধ্যে নেই, আছে সমাজের জন্য মুসলমানেরই সিত্যকার পরিশ্রমের মধ্যে।"

৪. **রাজনৈতিক সমস্যাঃ** মুসলিম সাহিত্য সমাজের চিন্তাবিদগণ রাজনৈতিক জটিলতার মধ্যে না গেলেও এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা এড়াতে সমর্থ হন নি। কারণ সমাজ-জীবন রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। আর এ উপমহাদেশের রাজনীতি তখন একটি যুগসন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছিল। বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) ও স্বদেশী আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ রদ (১৯১১), প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪), রাউলাট আইন ও দ্বৈতশাসন (১৯১১), অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০), ভারত শাসন আইন (১৯৩৫) প্রভৃতি পাক-ভারত বাংলাদেশ উপমহাদেশের তথা বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমানদের জীবনকে এ সময় নিয়ন্ত্রিত করেছে। তা ছাড়া, এ সময় শ্রী অরবিন্দ প্রমুখের নেতৃত্বে বিপ্লববাদ মাথাচাড়া দিতে থাকে। এ সময়ে বাংলাদেশের কৃষক সমাজও কমিউনিষ্ট কর্মীদের অধীণে সঙ্গবদ্ধ হতে থাকে। কাজী নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক হেমন্ত কুমার সরকার, কুতুব উদ্দীন আহমদ প্রমুখের নেতৃত্বে "বঙ্গীয় কৃষক-শ্রমিক দল" (১৯২৫) গঠিত হয়। মুসলিম সাহিত্য সমাজের অধ্যাপক আবুল হোসেন, আবদুল কাদির ও মোতাহার হোসেন চৌধুরী এই বিপ্লবী দলকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। ফলে রাজনৈতিক জীবনেও একটা বিপ্লবী মাত্রা এনে দেয় মুক্তচিন্তার অনুসারীরা।

৫. **ললিতকলার চর্চা:** সঙ্গীত, চিত্রকলা, অভিনয় প্রভৃতি ললিত-কলার চর্চার ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমান সমাজের মধ্যে বেশ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল, আর এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কারণও ছিল দ্বিবিধ– (১) অস্থির রাজনৈতিক অবস্থা ও (২) ধর্মীয় বিধি-নিষেধ। মুসলমান গান গাইবে না, ছবি আঁকবে না, এক কথায় মনোরঞ্জনকর ললিতকলার কোনও সংশ্রবেই থাকবে না এমন ধারণা পোষণ করা হত।" ললিতাকলা সম্পর্কে মুসলিম সাহিত্য সমাজ তথা রক্ষণশীল দলের মধ্যে পত্র পত্রিকায় যে সব বিতর্কের অবতারণা হয়, শেষ পর্যন্ত বলিষ্ঠ লেখক আকরম খাঁ সাহেব তাঁর সমাধান দেন। তাঁর ভাষায় সঙ্গীত মানুষের মনের সংকীনতা দূর করে মনের উদারতা ও প্রসারতা বাড়ায়, উগ্রতাকে জাগ্রত করে তা সঙ্গীত নয়, সঙ্গীত আত্মাকে ত্যাগ করে জীবনকে করে আনন্দময়। মুসলিম সাহিত্য সমাজের চিন্তাবিদগণ বাঙালী মুসলমানদের মধ্য থেকে এই 'ট্যাবু' উৎপাদিত করতে শক্তিশালী প্রয়াস চালান। কাজী মোতাহার হোসেন বলেন, "তাই আজ প্রাণ খুলে বলতে চাই, মোতাহার বাঁচার মত বেঁচে থাকব,– জীবনকে সার্থক করব, সুন্দর করব, উপভোগ করব, আনন্দ রসে অভিষিক্ত করব,– আমরা প্রতিভার জন্ম দিব, জগত ধন্য, বরেণ্য হব।" এভাবে মুক্তচিন্তার চর্চা চলতে থাকে।

৬. **ধর্ম হতে রাজনীতিকে আলাদা করার প্রয়াস:** মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুক্ত বিচারবুদ্ধিতে আতঙ্কিত হয়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মোল্লা-মৌলভীদের দল এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ উত্থাপন করেন এবং তাঁদের কাউকে কাউকে নাজেহালও করেন। যেখানে জীবনকে গভীর ও বিচিত্র রূপে আস্বাদনের প্রবণতা ও শক্তি নেই, সেখানে কুসংস্কারের জঞ্জাল সবকিছুকে আবৃত করে রাখে। সেখানে আর যাই কিছু থাক ধর্মের সারবস্তু কিছুই নেই। ধর্মের মূলকথা হলো মানসিক উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজের পঙ্কিলতাও কল্যাণের পরিপন্থী সব আয়োজনকে নস্যাৎ করে দেয়। সে কারণে মুসলিম সাহিত্য সমাজের মতো প্রগতিপন্থী একটি প্রতিষ্ঠানকে ক্ষয়িষ্ণু সমাজের রোষানলেও পড়তে হয়েছিল। সমাজ সম্পর্কে সমকালীন "মাসিক জাগরণ" পত্রিকার মন্তব্য অনুসারে বলা যায়। অনেকের ধারণা এই সমাজ স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে নানা প্রকার উশৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আবার এই সমাজকে ধর্মদ্রোহী বা ইসলামদ্রোহী বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যা ছিলা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ঈর্ষামূলক কাজেই ধর্মালোচনা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এতে এ মনে করা ঠিক নয় যে, এই 'সমাজ' ইসলামকে, কোরানকে উড়িয়ে দিতে চায়, বিষয়টি এমন নয় বরং এই সমাজ ইসলামের বিধিবিধান, কোরআন ও হাদীসকে বুদ্ধির আলোকে দেখতে চেয়েছে। আর এখানেই সমাজপন্থীদের সঙ্গে সুবিধাবাদীদের সংঘাত। যে সংঘাত থেকে জন্ম সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ, হিংসা-বিদ্বেষের রাজনীতি ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার নানাদিক। তাই মুক্তচিন্তার চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে ধর্মকে রাজনীতি থেকে আলাদাভাবে দেখার যে প্রয়াস তা আজও অব্যাহত আছে এ দেশের মানুষের মধ্যে। সব ধর্মের মানুষই যাতে স্বীয়ধর্ম পালনের সুষ্ঠ পরিবেশ পায় ও শান্তিপূর্ণভাবে সহবস্থান করতে পারে সে জন্য প্রয়োজন ধর্মীয় গোঁড়ামীমুক্ত একটি সমাজ, যা কেবল স্বাধীন চিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির চর্চাতেই গঠন করা সম্ভব। আর তাই ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার না বানিয়ে তাকে আলাদা রাখাই শ্রেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৭

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. মুক্তচিন্তা ও বুদ্ধিমুক্তি আন্দোলন বাঙালীর দর্শনের কোন ধরনের আন্দোলন?
   ক. প্রয়োগবাদী আন্দোলন
   খ. বাস্তববাদী আন্দোলন
   গ. যৌক্তিক আন্দোলন
   ঘ. বুদ্ধিবাদী ও মানবতাবাদী আন্দোলন

২. মুসলিম সাহিত্য সমাজ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
   ক. ১৯২৫ সালে
   খ. ১৯৪৭ সালে
   গ. ১৯৩৫ সালে
   ঘ. ১৯০৫ সালে

৩. বিচার বুদ্ধিকে অন্ধ সংস্কার ও শাস্ত্রানুগত্য থেকে মুক্ত করাই ছিল খাদেব প্রধান লক্ষ্য তারা হলো–
   ক. মুক্ত চিন্তার প্রবর্তক
   খ. বুদ্ধি মুক্তির আন্দোলনের প্রবর্তক
   গ. উভয়টিই

উত্তরমালা: ১. ঘ, ২. ১৯২৫, ৩. গ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. মুক্তিচিন্তা বলতে কী বোঝায়?
২. মুক্তচিন্তার পটভূমি ব্যাখ্যা করুন।
৩. মুক্তচিন্তা কিভাবে মুক্তবুদ্ধির আন্দোলনে রূপ নেয় কাদের প্রচেষ্টায়?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. মুক্তচিন্তার পটভূমি ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২. মুক্তচিন্তার প্রবর্তক কারা? তাঁদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য তুলে ধরুন।
৩. কোন কোন সামাজিক সমস্যা নিয়ে মুক্তচিন্তার যাত্রা শুরু হয়। কীভাবে তার বিকাশ ঘটে- আলোচনা করুন।

পাঠ ৭.৮ নাগরিক মান উন্নয়ন এবং শিক্ষা
Standardization Citizen and Education

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- নাগরিক ও নাগরিকতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নাগরিকতার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- নাগরিকতার মান উন্নয়নে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষার মাধ্যমে নাগরিকতা বিকাশের উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।

নাগরিক ও নাগরিকতার ধারণা

'নাগরিক' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Citizen'। এটি ল্যাটিন শব্দ 'Civitas' থেকে এসেছে, যার অর্থ 'People united in a city or community'. অতএব, ব্যুৎপত্তিগত অর্থে কোন নগরের বা সমাজের অধিবাসীদেরকে নাগরিক বলে, যারা কিছু সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে এবং কিছু কর্তব্য পালন করে। বর্তমানে নাগরিক কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। কারণ বর্তমানে রাষ্ট্রের সীমা অনেক বেড়েছে এবং এর ভিতর নগর ও গ্রাম দুইই আছে। তাই আধুনিক সংব্যাখানে নাগরিক বলতে একটি রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী সকল ব্যক্তিকে বুঝায়। নাগরিকগণ রাষ্ট্রের প্রদত্ত সকল অধিকার ভোগ করে এবং বিনিময়ে রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে। আর রাষ্ট্রের কাছ থেকে নাগরিকের প্রাপ্য রাজনৈতিক অবস্থানই হলো নাগরিকতা। নাগরিকতার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ–

১. রাষ্ট্রের সদস্য হওয়া।
২. রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা।
৩. সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ (নিরাপত্তা, স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও চিন্তা করা, চলাফেরা ও সম্পত্তি, স্বাধীনভাবে কাজ করা, শিক্ষা, রাষ্ট্রের শাসন কাজে অংশগ্রহণ) ইত্যাদি।
৪. রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করা (কর প্রদান, বিধি-নিষেধ মেনে চলা, রাষ্ট্রীয় শাসনকার্যে সহায়তা করা এবং উৎপাদনে অংশগ্রহণ করা)।

দেখা যাচ্ছে নাগরিকতা কেবল একটি তাত্ত্বিক বিষয় নয়, বরং একটি সক্রিয় ধারণা (Active Concept)। এর সাথে সমাজ তথা রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণের বিষয়টি জড়িত। নাগরিক হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার জন জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জ্ঞান/ধারণা অর্জনের পাশাপাশি নাগরিকের কল্যাণ সাধনের মনোভাব এবং জনকল্যাণে পরিচালিত কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয় দক্ষতা রয়েছে। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এ ধরনের নাগরিক গড়ে তোলা গণতন্ত্রের সফলতার অন্যতম পূর্বশর্ত।

নাগরিকতার শিক্ষার ধারণা ও গুরুত্ব

নাগরিকতার বৈশিষ্ট্য জন্মগতভাবে তৈরি হয় না, বরং গড়ে তুলতে হয়। প্রত্যেক মানুষ কিছু মৌলিক চাহিদা রয়েছে এবং জন্মের পর মানুষ প্রথমেই চায় এগুলোর পরিপূরণ। এসব চাহিদার সবগুলোই ব্যক্তিকেন্দ্রিক। শিক্ষার অন্যতম কাজ হলো ব্যক্তিকেন্দ্রিক এসব চাহিদা পূরণের সক্ষমতা তৈরির পাশাপাশি ব্যক্তিকে সমাজ কল্যাণের পথে

পরিচালিত করা। এভাবে শিক্ষাকে নাগরিকতা প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা না গেলে সুনাগরিক গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। আর নাগরিক যদি সুনাগরিক না হয় তাহলে গণতন্ত্রের ভিত্তি ভেঙ্গে পড়বে।

নাগরিকের যথাযথ মান উন্নয়ন করতে হলে নাগরিকতার শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। নাগরিক শিক্ষা বলতে সেই শিক্ষাকে বুঝায় যা ব্যক্তিকে শিশুকাল থেকেই পরিচ্ছন্ন মনের অধিকারী আলোকিত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার শিক্ষা দেয়, যারা সমাজের/রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রকে স্বপথে পরিচালিত হতে সক্রিয় ভূমিকা রাখবে। এ অর্থে নাগরিকতার শিক্ষা দুটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে আলোকপাত করে–

১. মানবাধিকার– যা ব্যক্তি নৈতিকতা ও আইনের আওতায় ভোগ করে।
২. নাগরিক অধিকার– একটি রাষ্ট্রের সংবিধানে স্বীকৃত সিভিল ও রাজনৈতিক অধিকার।

মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার পরস্পর নির্ভরশীল। মানবাধিকারে সকলের সমান অধিকার ও মর্যাদা স্বীকৃত। আর নাগরিকতার শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হল ব্যক্তিকে নাগরিকতা ও মানবাধিকারের শিক্ষায় শিক্ষিত করার মাধ্যমে তার বিচার বিশ্লেষণ ও সূক্ষ্ম অনুভূতিমূলক দক্ষতার অনুশীলন করতে শেখানো যার মাধ্যমে সে একক ও সমষ্টিগতভাবে তার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের মনোভাব ও দক্ষতা অর্জন করবে। সুনাগরিক হওয়ার জন্য যে সব মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক গুণ থাকা দরকার তা শিক্ষার মাধ্যম ছাড়া বিকাশ করা সম্ভব নয়। শিক্ষারও একটি অন্যতম লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের সতকর্তার সাথে নাগরিকতার শিক্ষা প্রদান করা। এজন্য প্রয়োজন আদর্শ শিক্ষা পরিকল্পনা যাতে ব্যক্তি শিশুকাল থেকেই নাগরিকতার বৈশিষ্ট্য অর্জনের সক্ষম হয়। নাগরিকতার শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হবে মানবাধিকারে স্বীকৃতি, সামাজিক দায়িত্ববোধ ও নৈতিকতা, গণতন্ত্রে সরকারের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক এবং স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে নাগরিকের দায়িত্ববোধ সৃষ্টি ও উন্নয়ন।

নাগরিকতার বিকাশে শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

নাগরিকতার শিক্ষা বলতে কেবল নাগরিকদের শিক্ষাদান করাকেই বুঝায় না, সেই সাথে তাদের ভবিষ্যত পরিণত জীবন ও নাগরিকতার শিক্ষা প্রদান করাকেও বুঝায়। নাগরিকতার শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য তিনটি। যথা–

১. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও নীতিমালা সম্পর্কে জানার মাধ্যমে ব্যক্তিকে নাগরিকতা এবং মানবাধিকার সম্পর্কে শেখানো।
২. যে কোন কর্মকাণ্ডে ব্যক্তির বিচার করার ও সূক্ষ্ম এবং যৌক্তিকভাবে চিন্তার ক্ষমতার বিকাশসাধন এবং
৩. এককভাবে ও সমষ্টিগতভাবে সামাজিক দায়িত্ব পালনের মনোভাব সৃষ্টি।

নাগরিকতার শিক্ষা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের একটি আবশ্যিক দিক। সাধারণত শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভূক্ত সমাজ পাঠ বা সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের মাধ্যমে নাগরিকতার বিভিন্ন দিকগুলো শেখানো হয়। এছাড়া অন্যান্য বিষয়ের পাঠেও নাগরিকতার ধারণাগুলো সমন্বয় করা হয়। বিষয়বস্তু হিসেবে সেখানে প্রধানত নাগরিকতার ধারণা মুখস্থ নির্ভর তথ্য জানানোর ও শেখানোর চেষ্টা করা হয়। শিক্ষন-শেখানো পদ্ধতি হিসেবে গৃহীত হয় বক্তৃতা, আলোচনা ইত্যাদি। সে ক্ষেত্রে নাগরিকতার বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলির বাস্তব প্রয়োগ বা অনুশীলনের সুযোগ খুবই সীমিত।

নাগরিকতার ধারণা বর্তমানে একটি বৈশ্বিক বিষয়। মানবাধিকারের স্বীকৃতি হিসেবে বর্তমান বিশ্বে একটি জাতীয় সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত বহুমুখী সংস্কৃতি ও অভিজ্ঞতার বিভিন্নতাকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাড়িয়েছে। বাংলাদেশসহ অনেক দেশের নাগরিকতায় শিক্ষায় এ দিকগুলো উপেক্ষিত হচ্ছে। বর্তমান বিশ্বের জ্ঞান বিজ্ঞানে ও প্রযুক্তিখাতের প্রভূত উন্নয়ন সক্রিয় নাগরিকতার ধারণায় গুরুত্ব দিচ্ছে। ফলে জাতীয় পর্যায়ে সুনাগরিক সৃষ্টির পাশাপাশি প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাজারের সাথে খাপ খাওয়ানের উপযোগী আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন

নাগরিক তৈরির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তাই প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যমান নাগরিকতার শিক্ষার সংস্কারের মাধ্যমে আধুনিক, যুগোপযোগী, সক্রিয় ও বিশ্বমানের নাগরিকতার শিক্ষা জরুরি হয়ে পড়েছে। এ গুরুদায়িত্বটি পালনের প্রধান কর্ণধার হচ্ছে যে কোন দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। এক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নিম্নরূপ কাজ করতে পারে। যেমন–

১. **যথাযথ জ্ঞান ও তথ্য পরিবেশন:** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ আদর্শ নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান ও তথ্য পরিবেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২. **ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা:** প্রচলিত পদ্ধতির মুখস্ত নির্ভর শিক্ষার পরিবর্তে কর্মনির্ভর পদ্ধতিতে নাগরিকতার শিক্ষা দিতে হবে। এজন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে নাগরিকতার বিকাশে বিভিন্ন ধরনের অনুশীলন করাতে হবে। প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-কানুন, পলিসি তৈরি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, সহযোগিতামূলক ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ইত্যাদি কর্মকাণ্ড গ্রহণের মাধ্যমে তা করা যায়।

৩. **বহুমুখী শিখন-শেখানো পদ্ধতি:** কেবলমাত্র বক্তৃতা ও আলোচনার পরিবর্তে শিক্ষার্থী নির্ভর বিভিন্ন অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি (ড্রয়িং, অভিনয়, দলগত কাজ, জোড়ায় কাজ ইত্যাদি) ব্যবহার করে শেখাতে হবে। এ ধরনের শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান অপেক্ষাকৃত টেকসই হয়ে থাকে।

৪. **Cross Curricular বিষয় হিসেবে বিবেচনা:** কেবল পৌরনীতি বা সামাজিক বিজ্ঞান নয়, অন্যান্য শিক্ষাক্রমিক বিষয়ের মাধ্যমেও সুনাগরিকতার গুণাবলিগুলো অর্জন করাতে হবে।

৫. **জাতীয় বনাম বৈশ্বিক নাগরিকতার শিক্ষা:** বিশ্বায়নের এ যুগে মানুষের গতিশীলতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে একই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি । এই সাংস্কৃতিক বিভিন্নতাকে সম্মান করতে শেখানোর মাধ্যমে বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্যের সূর সৃষ্টির দায়িত্বও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের।

৬. **সামাজিক দায়িত্ব পালনে সচেতন করা:** শিক্ষার্থীকে সমাজ জীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এ সচেতনতা তৈরি হবে। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ হবে আদর্শ সমাজ সৃষ্টি করে এবং সমাজ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করা। এই সমাজ সচেতনতা থেকেই আসবে বৃহত্তর সমাজ জীবনের দায়িত্ববোধ।

৭. **মানবাধিকারের শিক্ষা:** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, জাতি, অর্থনৈতিক গোষ্ঠী ইত্যাদি শিক্ষার্থী থাকতে পারে। সবকিছুর উর্ধ্বে তাদের পরিচয় তার একটি দেশের নাগরিক, তারা সবাই সমাজের অংশ। অতএব, সকলের প্রতি সমান মনোভাব প্রদর্শন এবং সকলকে শ্রদ্ধা করতে শিখাতে হবে।

৮. **সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির ব্যবস্থা:** বিভিন্ন ধরনের সহশিক্ষাক্রমিক কাজ নাগরিকতার বৈশিষ্ট্য বিকাশে সহায়তা করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসব কাজের আয়োজন করতে হবে। যেমন– বিএনসিসি, গার্লস গাইড, স্কাউট ইত্যাদি। নাগরিকতা শিক্ষার অংশ হিসেবে নাগরিকতা ক্লাব গঠন করেও নাগরিকতার বৈশিষ্ট্য অর্জনের চর্চা করা যায়। এসব কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা গোষ্ঠী জীবনের বসবাসের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পায়।

৯. **আধুনিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা:** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা সভা আয়োজন ও ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে নাগরিকতার শিক্ষা দেওয়া যায়। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তি যদি কোন সমস্যা (সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক) সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করতে না পারে তাহলে নাগরিকতার বিকাশ হয় না।

১০. **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমাজের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক সৃষ্টি:** সুনাগরিকের প্রধান গুণ হলো সমাজ জীবন সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান। এ জ্ঞান অর্জন করতে হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমাজের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকতে হবে। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার শিক্ষার্থীদের সমাজ জীবনের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ তৈরি করবে।

প্রয়োজনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কমসূচিকে সামাজিক চাহিদা অনুযায়ী পুনর্বিন্যাস ও সংগঠিত করতে হবে।

১১. **শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি তৈরিঃ** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক পরিবেশ না থাকলে শিক্ষার্থীরা মত প্রকাশে ব্যর্থ হয়। ফলে তার নাগরিকতার শিক্ষায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডিসহ বিভিন্ন কমিটিতে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের মতামত নিতে হবে। উন্মুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে এসব বডিতে শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ থাকতে হবে।

১২. **সকল নাগরিকের প্রতি সমান দৃষ্টিভঙ্গী তৈরিঃ** বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন কারণে স্থানান্তরের হার বেড়েছে। ফলে এক দেশের নাগরিক অন্য দেশেল নাগরিকত্ব পাচ্ছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে জন্মসূত্রের নাগরিকত্ব ও অর্জিত নাগরিকত্বের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্যের কারণে সমাজে নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হলো সকল নাগরিকের প্রতি সমদৃষ্টিভঙ্গী ও সমান সুযোগ তৈরিতে কাজ করা।

শিক্ষাকে নাগরিকতার প্রশিক্ষণের কাজে নিয়োজিত করতে হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে উপরিউক্ত দায়িত্বগুলো পালন করতে হবে। প্রয়োজনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচিতে পরিবর্তন রাখতে হবে। এসব কিছুর সার্থকতার মূলে রয়েছেন শিক্ষক। তিনি নিজে যদি আদর্শ নাগরিক না হন, তাহলে তার শিক্ষার মাধ্যমে আদর্শ নাগরিক গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৮

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. নাগরিকতার বৈশিষ্ট্য কোনটি?
   ক. রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য
   খ. অস্থায়ী বসবাস
   গ. কর না দেওয়া
   ঘ. রাজনৈতিক অধিকারহীনতা

২. নাগরিকতার শিক্ষার একটি মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে–
   ক. ব্যক্তির দায়িত্ববোধ উন্নয়নে শিক্ষার ব্যবস্থা করা
   খ. ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করা
   গ. সামাজিক দায়িত্ববোধ ও মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতন করা
   ঘ. অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার শিক্ষা প্রদান

৩. নাগরিকদের মানবাধিকারের শিক্ষায় শিক্ষিত করতে কোনটি অধিকতর সহায়ক?
   ক. সহশিক্ষাক্রমিক কাজ
   খ. বহুমুখি শিখন-শেখানো পদ্ধতির
   গ. গণতান্ত্রিক পরিবেশ
   ঘ. সকলের প্রতি সমান মনোভাব ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের শিক্ষা

উত্তরমালা: ১. ক, ২. গ, ৩. ঘ

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. নাগরিক ও নাগরিকতা বলতে কী বুঝায়?
২. আধুনিক রাষ্ট্রে কাদেরকে নাগরিক বলা হয়?
৩. বর্তমানে কীভাবে নাগরিকতার শিক্ষা দেওয়া হয়?
৪. নাগরিকতার শিক্ষায় কী ধরনের পরিবর্তন আনা প্রয়োজন?
৫. নাগরিকতার বিকাশে শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে কী ধরনের সহ শিক্ষাক্রমিক কাজের ব্যবস্থা করা যায়।

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. নাগরিকতায় শিক্ষা কাকে বলে? এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
২. নাগরিকতার শিক্ষার উদ্দেশ্য কী? এর বিকাশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।
৩. নাগরিকতার যথাযথ নাগরিকতার শিক্ষায় শিক্ষিত করার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কী ধরনের কর্মকান্ড আয়োজন করতে পারে।